ছিন্ন বীণার নন্দনগান

সাগরিকা সেনগুপ্ত

মিলনসাগরে প্রথম প্রকাশিত ১.১১.২০২১ তারিখে।

‘একা মোর গানের তরী ভাসিয়েছিলাম নয়ন-জলে ;
সহসা কে এলে গো এ তরী বাইবে ব’লে?
.....বুঝি মোর করুণ গানে ব্যথা তার বাজল প্রাণে,
এলে কি দু কূল হ’তে কূল মেলাতে এ অকূলে?’

নিজের গানকে যিনি করুণ গান বলেছিলেন, সেই বেদনা বিধুর নয়ন-জলের গানের আকর ছিল যাঁর জীবনের ব্যথাতুর একক যাপনচিত্র, তিনি অতুলপ্রসাদ সেন ; ---ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের কবি, গীতিকার, ও সুরকারদের মধ্যে অন্যতম। বঙ্গসংস্কৃতির মধ্যগগনে তখন উজ্জ্বল রবীন্দ্রনাথের মতো ভাস্কর। তৎসত্ত্বেও অতুলপ্রসাদ গানের স্বতন্ত্রতায় সে আকাশে সতত ভাস্বর ছিলেন। রচিত গানের সংখ্যা মাত্র ২০০ র কিছু বেশি, কিন্তু তাতেই আজও 'অতুলপ্রসাদের গান' বাংলা তথা বাঙালির সংস্কৃতিতে স্বতন্ত্রতায় অক্ষুণ্ন! মনে রাখা দরকার, সে সময়ে একই সাথে কান্তকবি রজনীকান্ত সেন এবং নাট্যকার ও গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও বাঙালির কৃষ্টিকে স্বমহিমায় গরিমাঋদ্ধ করে চলেছেন। এর পরেই আর এক নক্ষত্র কাজী নজরুলের আবির্ভাব। এই পঞ্চকবির গান যেমন সমকালীন বাংলা গানের সম্ভারকে সমৃদ্ধ করেছিল, তেমনই আজও আমরা প্রতিনিয়ত তাদের রচনায়, সুরের আঙ্গিকে, গায়কীতে ও ভাবমাধুর্য্যে মোহমুগ্ধ হয়ে থাকি--এঁদের সৃষ্টি চিরকালীন। তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়,--- এই তিন গীতিকার ও সুরকার তাঁদের যথাযোগ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত থেকেছেন। এ ব্যর্থতা আমাদের, বাঙালি জাতির! এ বছর অতুলপ্রসাদ সেনের জন্মের সার্ধশতবর্ষপূর্তি। সে উপলক্ষ্যে সেই আত্মগ্লানি থেকে কিছুটা উত্তরণের প্রয়াসে আমাদের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি!

অতুলপ্রসাদ সেন।

নবজাগরণের কবি তথা এই পঞ্চকবির অন্যতম অতুলপ্রসাদ সেনের জন্ম ১৮৭১ সালের ২০শে অক্টোবর, তাঁর মাতামহ শ্রী কালীনারায়ণ গুপ্তর ঢাকার বাড়িতে। পিতা ছিলেন অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুরের এক অখ্যাত ও গরীব বৈদ্যকূলের সন্তান, শ্রী রামপ্রসাদ সেন। মা ছিলেন কালীনারায়ণ গুপ্তর কন্যা হেমন্তশশী। বালক অতুলপ্রসাদের মানসিক ও চারিত্রিক গুণাবলীর সমন্বয় ঘটেছিল একাধারে তার পিতা ও মাতামহের উত্তরাধিকারসূত্রে। কবিরাজ বাড়ির ক্ষুদ্র গণ্ডী তার পিতা রামপ্রসাদকে আটকে রাখতে পারে নি। প্রায় কপর্দকহীন অবস্থায় তিনি ভাগ্যসন্ধানে এসে পৌঁছান কলকাতায়। সেখানে তখন ব্রাহ্মসমাজের বড় বড় মাথারা, অর্থাৎ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব চন্দ্র সেন, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী জীবিত। সৌভাগ্যক্রমে রামপ্রসাদ সেন মহর্ষির সঙ্গে পরিচিত হলেন এবং অল্পসময়ের মধ্যে তাঁর অত্যন্ত স্নেহভাজন হয়ে উঠলেন।

কবির পিতা রামপ্রসাদ সেন। সৌজন্যে আলামি ওয়েবসাইট।

সে সময় বড় উত্তাল। বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক ও নাগরিক জীবন তখন নবজাগরণের ঢেউ এ দোদুল্যমান। পশ্চিমী ভাবধারার মননে ও চেতনায় বঙ্গীয়সমাজ তখন আত্মবীক্ষণে সচেতন হয়ে উঠছে ; কূপমণ্ডুকতার বেড়া ডিঙিয়ে মেধাবী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সমাজের উন্নতিকল্পে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে গড়ে উঠছে ব্রাহ্মসমাজ। সমাজের মূলমন্ত্র ছিল সর্বধর্মেরই একেশ্বরবাদকে কেন্দ্র করে মানবজাতির নৈতিক পুনর্জাগরণ। রামমোহনের পরে ব্রাহ্মসমাজের হাল ধরলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। কালীনারায়ণ ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্য, অন্যদিকে রামপ্রসাদ অনুসরণ করলেন কেশবচন্দ্র সেনের নতুন ধারার ব্রাহ্মচেতনার ফসল--- 'নববিধান' এর সমাজকে। কিন্তু এর জন্য তাঁদের কখনও মনান্তর ঘটে নি। রামপ্রসাদ দেবেন্দ্রনাথের আনুকূল্যে ভর্তি হলেন মেডিক্যাল কলেজে। পাশ করার পরে সরকারী চাকরী নিয়ে পাগলা গারদের ডাক্তার হিসাবে ঢাকায় ফিরে আসেন। এই চাকরীতে থাকাকালীনই তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন এবং কালীনারায়ণের কন্যা হেমন্তশশীকে বিবাহ করেন। সম্ভবতঃ ঐ সময়ে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মের প্রচারে ঢাকায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

এইবার তাঁর একাকী পথ চলা, কারণ ব্রাহ্ম ধর্ম নেওয়ার ফলে তিনি গৃহ ও সমাজচ্যুত হলেন। ফলে তিনি মিরাতারে একটি ভাড়া বাড়িতে উঠে আসেন। নিজেই একটি ডিসপেন্সারি খোলেন। চিকিৎসক হিসাবে ধীরে ধীরে তাঁর যশ ছড়িয়ে পড়ে, আর্থিক অবস্থারও প্রভূত উন্নতি হয়।

হেমন্তশশী অত্যন্ত গুণী ও ব্যক্তিত্বময়ী, অথচ ঈশ্বরভক্ত, স্নেহশীলা মানুষ ছিলেন। তিনি কবিতা ও গান রচনায়ও পারদর্শী ছিলেন। ওদিকে রামপ্রসাদও অত্যন্ত সুবক্তা হওয়ায় নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক সভায় যোগদান করতেন। তিনিও গান বাঁধতেন, উদাত্ত কণ্ঠে শ্লোকপাঠ করে উপাসনা করতেন। এই সময়েই অতুলপ্রসাদের জন্ম। বালক অতুলপ্রসাদের মনে ধীরে ধীরে পিতার গান ও সংস্কৃত শ্লোকপাঠ এবং পিতামাতা উভয়েরই ঈশ্বরভক্তি এক অন্যতর জীবনবোধের জন্ম দিল। অতুলপ্রসাদের সাত বছর বয়সের সময়ে গুরুপ্রসাদের ছেলে সত্যপ্রসাদকে নিজের কাছে এনে

রাখলেন রামপ্রসাদ। দুই ভাইই এই পরিবেশে বড় হতে লাগলেন, সঙ্গে উপাসনা, সংস্কৃত শ্লোকপাঠের শিক্ষা ও গানের শিক্ষা --সবই একসাথে চলত।

উপাসনার জন্য স্থানাভাব হওয়ায় মিরাতারের বাড়িতেই ব্রাহ্মসমাজের গান-বাজনা, উপাসনার আয়োজন হতে লাগল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনুগামী হওয়া সত্ত্বেও কালীনারায়ণও সেই সব সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। বালক অতুল আনন্দের সঙ্গে সে সব গান উন্মুখ হয়ে শুনতেন। মাঝে মাঝে নিজেও শোনাতেন। বাবার গানের সাথে খোল সঙ্গতও করতেন, এ কারণে রামপ্রসাদ অতুলকে একটি ছোট খোলও কিনে দেন।

কিন্তু এ আনন্দসভা অচিরেই গুটিয়ে নিতে হল, কারণ বাড়ির মালিক আর তাঁদের থাকতে দিলেন না। ফলে স্ত্রী হেমন্তশশী, অতুল ও সত্য-দুই বালক এবং তিন কন্যা-হিরণ, কিরণ ও প্রভাকে নিয়ে রামপ্রসাদ কালীনারায়ণের আশ্রয়ে লক্ষ্মীবাজারে চলে যান। ডিসপেন্সারির পাশে একটি ঘরে দিনযাপন ও কালীনারায়ণের লক্ষ্মীবাজারের বাড়িতে রাত্রিযাপন-এভাবেই চলছিল। কিন্তু, বিধি বাম। রামপ্রসাদের এবারের কাঁটা হল একটি ব্রণ, যেটি একটি ফোঁড়ায় পরিণত হল। নিজেই তার অস্ত্রোপচার করলেন। কিন্তু তাঁর বহুমূত্র দোষে সেটি নিরাময় না হয়ে কার্বাঙ্কলে পর্যবসিত হল, ও ক্রমে প্রাণসংশয় উপস্থিত হল। এ সময়ে তাঁকে লক্ষ্মীবাজারে নিয়ে আসা হয়। অবশেষে ১২৯১ এর ১৬ই কার্তিক (৩১শে অক্টোবর ১৮৮৪) তাঁর দেহাবসান হল।

এ অবস্থায় হেমন্তশশী পুত্র-কন্যাসহ লক্ষ্মীবাজারেই রয়ে গেলেন। সঙ্গে সত্যপ্রসাদও। এর পর থেকে হেমন্তশশী নিজেকে খানিকটা অন্তরীণ করে ফেলেন। ঘর বন্ধ করে ভগবানের নাম করতেন, কবিতা লেখায় মনোনিবেশ করতেন। এই সময় থেকেই হেমন্তশশীর স্বাস্থ্যেও ভাঙন ধরছিল।
বালক বয়সেই পিতার মৃত্যু অতুলপ্রসাদের প্রথম আঘাত। আমাদের মনে রাখতে হবে, এই রকম বহু আঘাতে অতুলের ভবিষ্যৎ জীবন ক্রমশঃ দীর্ণ হয়েছে। অথচ এই আঘাতগুলিই কিন্তু অতুলপ্রসাদের সুরের সোপানের উৎস ছিল।

তাঁর পিতার মৃত্যুর পর সে ক্ষতে প্রলেপ দিয়েছিল কালীনারায়ণের বাড়ির গানের আবহ। মানসী মুখোপাধ্যায় যেমন বলেছেন, ‘সঙ্গীত ছিল অতুলপ্রসাদের রক্তে, হৃদয়ে ও কণ্ঠে।’ মিরাতারের বাড়ির উপাসনার সুরমূর্চ্ছনা বালক অতুলের মধ্যে গানের যে অঙ্কুরোদ্গম করেছিল,--- যে বাঁশি, হারমোনিয়াম ও বেহালার বাদনশৈলী তিনি তখন থেকেই আয়ত্ব করেছিলেন, সে সব কোমল চারারা আরও ডালপালা মেলল ঠাকুরদাদা (এই নামেই তিনি মাতামহকে ডাকতেন) কালীনারায়ণ গুপ্তের বাড়িতে এসে। বাড়িটিকে 'গানের বাড়ি'ই বলা যায়। ঠাকুরদাদা ব্রাহ্মসমাজের জন্য গান লিখে সুর-সংযোজন করতেন। মাসী সুবালার মধুর কণ্ঠের গান তাঁকে ব্যাকুল করত। কালীনারায়ণের নগরকীর্তনে মাঝেমাঝেই তাঁকে যোগ দিতে হত ও একসময়ে তিনিই সে কীর্তনের মূলগায়েন হয়ে উঠতেন। এ সবের মধ্যে থেকে ক্রমশঃ তাঁর ভিতরে গানের জন্ম হতে থাকে নিভৃতে। সেই গানের প্রথম স্ফুরণ ঘটল বড়মামা কৃষ্ণগোবিন্দের মেয়ে তপসীর অন্নপ্রাশনে।
লিখলেন---

‘তোমারি উদ্যানে তোমারি যতনে
উঠিল কুসুম ফুটিয়া
এ নবকলিকা হউক সুরভি
তোমার সৌরভ লুটিয়া....’

মা হেমন্তশশীর স্নেহসুধা সেদিন যেন বিশেষভাবে তাঁকে সিঞ্চিত করেছিল। তাই মনে আশা ছিল মাকে নিয়েই তিনি পাড়ি দেবেন তাঁর গানের ভেলায়। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছে ছিল বুঝি অন্যরকম।

একাকীত্ব ও মানসিক বিপর্যয়ের কারণে হেমন্তশশীর স্বাস্থ্য ভাঙতে শুরু করল, দাদা কৃষ্ণগোবিন্দ বোনকে তখন মাঝে মাঝে নিয়ে আসতেন কলকাতায় নিজের কাছে।

এ রকমই এক সময়। হেমন্তশশী কলকাতায়, অতুলপ্রসাদ ঢাকায়। ১৮৯০ সালের জুন মাস। এন্ট্রান্স পরীক্ষা শেষ, অতুলপ্রসাদ রবিবার ব্রাহ্মসমাজ থেকে বাড়িতে ফিরে এক অভাবনীয় সংবাদ পেয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। কলকাতা থেকে বড়মামা কৃষ্ণগোবিন্দ চিঠিতে জানিয়েছেন,-- হেমন্তশশী দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছেন চিত্তরঞ্জন দাশের জ্যাঠামশাই দুর্গামোহন দাশকে। অতুলের পায়ের তলার মাটি সরে গেল। বাবার অবর্তমানে যে মা কে আঁকড়ে ধরেছিলেন, তাঁর কাছ থেকে এমন আঘাত অতুলকে স্তব্ধ করে দিল।

হেমন্তশশী ও দুর্গামোহনের এ বিয়ে তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজও মেনে নিতে পারে নি। নানাদিকে সমালোচনার ঝড় উঠল। কিন্তু এটুকু বলতেই হয়, যে দুর্গামোহন সময়ের অনেক আগে চলতেন। সে সময় বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে তিনি তাঁর বিধবা বিমাতার বিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে সমাজের দিক থেকে নানাভাবে তাঁর মন বিদ্ধ হলেও তা তাঁদের দাম্পত্য সুখকে কেড়ে নিতে পারে নি। যদিও মাঝে কাঁটা হয়ে থাকল অতুলের হেমন্তশশীর প্রতি প্রবল অভিমান!

এর বেশ কিছুদিন পর হেমন্তশশী অতুলকে চিঠিতে অনুরোধ জানালেন, বোনেদের নিয়ে তাঁর কাছে চলে আসার জন্য। অভিমানী অতুল ঢাকার বাসগৃহ ছেড়ে বোনেদের নিয়ে দুর্গামোহনের কলকাতার বাড়িতে মায়ের কাছে পৌঁছে দিলেন বটে, কিন্তু মায়ের সাথে দেখা করলেন না। চলে গেলেন মামাদের কাছে। সেখানে মামারা তাঁকে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি করে দিলেন। এল জীবনের নতুন অধ্যায়। পড়াশুনার জগৎ এবং মামাতো ভাইবোনেদের সাহচর্য তাঁকে ধীরে ধীরে শান্ত ও সহজ করল। সেন পরিবারের এক নিকট আত্মীয়ার থেকে জানা যায়, পরে মায়ের সাথে পুত্র অতুলের দেখা হয়েছিল এবং অভিমানও কিয়দংশে ভেঙেছিল। দুর্গামোহনেরও অতুলের প্রতি স্নেহে কোনও ঘাটতি ছিল না।

অতুলের মনে আগে থেকেই স্বপ্ন ছিল, বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টার হবেন। মায়ের সঙ্গে বহু আগেই এসব নিয়ে আলোচনা হত। প্রেসিডেন্সীর পাঠ সে স্বপ্নে যেন ঘৃতাহুতি দিল। পড়াশুনার মধ্যপথেই, নভেম্বর মাসে ঠিক করে ফেললেন, বিলেত যাবেন আইন পড়তে। মামারা তো সম্মতি ও সামর্থ্য নিয়ে পাশে দাঁড়ালেনই, উপরন্তু মায়ের অনুরোধে স্বয়ং দুর্গামোহনও আর্থিক সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এলেন। তিনি অতুলের প্যাসেজ-মানি ও গরম পোশাকও জোগালেন। এই ঘটনায় অতুলপ্রসাদের সঙ্গে দুর্গামোহনের দুরত্ব অনেকটাই ঘুচেছিল। সৎ বাবা হলেও তাঁর স্নেহের ফল্গুধারায় কোনও শুষ্কতা ছিল না। জানা যায়, পরবর্তীতে দুর্গামোহন অতুলের তিন বোনেরও বিবাহ দিয়েছিলেন।

অতুলপ্রসাদ সম্বন্ধে আর একটি তথ্য দেওয়াও অত্যন্ত জরুরী। উনবিংশ শতকের নবজাগরণের একটি অন্যতম স্তম্ভ ছিল স্বদেশপ্রেম। বঙ্গদেশের কিশোর ও তরুণেরা অদম্য প্রাণশক্তি নিয়ে দেশসেবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তখন। সে জোয়ারে অতুলও উদ্বুদ্ধ হয়ে নানা সভায় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মত বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতা শুনতে ছুটে যেতেন। নিজেও এভাবে ধীরে ধীরে বাগ্মী হয়ে উঠেছিলেন। এ হেন অতুল কলেজে এসে চিত্তরঞ্জন দাশ, বিহারীলাল মিত্র, ব্রজেন্দ্রনাথ মিত্র ও অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এঁদেরকে সহপাঠী হিসাবে পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। অতুলপ্রসাদের মনে দেশসেবার বীজ বুনে দিয়েছিলেন মূলতঃ সুরেন্দ্রনাথ। অতুলের কাছে তাই দেশের মাটি শুধু মাটি নয়, দেশমাতৃকা, জন্মভূমি মা।

বিলেত যাওয়ার আনন্দের সাথে তাই দেশ ছেড়ে সুদূরে যাওয়ার ব্যথাও অতুলকে মূহ্যমান করে তুলল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তাঁর জাহাজ বিলেতের উদ্দেশ্যে রওনা হল। জাহাজঘাটে হেমন্তশশী ও দুর্গামোহন তাঁকে বিদায় জানাতে এলেন।

বিলেতের প্রবাসজীবন প্রথমে পছন্দ না হলেও পড়াশুনার জগৎ তাঁকে ধীরে ধীরে ভুলিয়ে দিল দেশ ছাড়ার বেদনা। লণ্ডনের 'মিডল টেম্পল' কলেজে ব্যারিস্টারী পড়তে শুরু করলেন। ডুবে গেলেন বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীর বইয়ের সম্ভারে।

ইংল্যাণ্ডের Middle Temple College ১৮৯৫, উইকিমেডিয়া। ইংল্যাণ্ডে A.P. Sen ১৮৯৫, সৌজন্যে উইকিমেডিয়া।

সেখানে আবার চিত্তরঞ্জনের সাহচর্য পেলেন, তিনিও তখন বিলেতে পড়তে গেছেন। পেলেন মনমোহন ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, সরোজিনী নাইডুকে। সবাই মিলে বাংলা সাহিত্যচর্চা কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুললেন 'স্টাডি সার্কেল', যার পুরোধা ছিলেন নামী সাহিত্যিক এডমণ্ড গস। বিলেত-প্রবাসী ভারতীয়দের সান্ধ্য মজলিশ বসত এখানেই। এই পরিবেশ আবার তাঁর মধ্যে গানের প্রতি বাসনা জাগিয়ে তুলল। বিলেত আসার পথে শুনেছিলেন ভূমধ্যসাগরের গণ্ডোলা চালকদের গান। সে সুর মনে বসে গিয়েছিল। সেই লোকসঙ্গীত ভাঙা সুর নিয়ে তিনি লিখলেন সেই বিখ্যাত গান 'উঠ গো ভারত-লক্ষ্মী, উঠ আদি-জগত-জন-পূজ্যা'।

অনেকে এই স্টাডি-সার্কেলে দ্বিজেন্দ্রলালের উপস্থিতির কথাও বলেছেন, তবে সে তথ্যটি ভ্রান্ত বলেই মনে হয়, কারণ দ্বিজেন্দ্রলাল ১৮৮৬ তেই বিলেত থেকে ভারতে ফিরে আসেন। তবে পরবর্তীতে দেশে ফিরে যে অতুলপ্রসাদের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রর অপরিসীম সখ্যতা গড়ে উঠেছিল, তাতে কোনও দ্বিমত নেই। বিলেতের স্থায়িত্ব কিন্তু অতুলপ্রসাদকে বিলিতি সুরের প্রতি কোনও মায়া জাগাতে পারে নি।

এ সময় চিত্তরঞ্জনের নানাবিধ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও অতুল পরিচিত হতে থাকেন। বৃটিশ পার্লামেন্টের এক সদস্য জেমস্ ম্যাকলীন যখন অনৈতিকভাবে মুসলিম ও হিন্দুদের যথাক্রমে 'দাস' ও 'চুক্তিবদ্ধ দাস' হিসাবে অভিহিত করেন, চিত্তরঞ্জন ও তাঁর সঙ্গীরা সেই উক্তির প্রতিবাদ করেন। তাতে অতুলও সামিল হন। তাঁদের সেই প্রবল প্রতিবাদের ফলস্বরূপ ম্যাকলীন সাহেব ক্ষমা প্রার্থনা ও পার্লামেন্টের সদস্যপদ ত্যাগ---দুইই করতে বাধ্য হন। এ ছাড়াও দাদাভাই নৌরজী যখন পার্লামেন্টের সদস্যপদ প্রার্থী হয়ে স্যালিসবেরীর প্রতিদ্বন্দিতা করতে উদ্যোগী হন, তখন নৌরজীর হয়ে চিত্তরঞ্জন তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে প্রচারে নামেন। শেষ অবধি নৌরজী পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন। এসবে অতুল মনে খুব উৎসাহ পান। এভাবে তাঁর রাজনৈতিক চেতনারও প্রসার ঘটে।

বিলেতে বাংলা সাহিত্যের এই স্টাডি সার্কেলে কেবল সাহিত্যের চর্চাই যে হত তা নয়, শিল্প ও সঙ্গীতও সমানভাবে আসন দখল করেছিল।

বিলেতে অতুলের মহান সঙ্গীতশিল্পী ম্যাডাম প্যাটের গান শোনার সৌভাগ্য হয়। তাঁর কণ্ঠে 'Home, sweet home' গানটি শুনে পরবর্তীতে অতুলপ্রসাদ একই সুরে তাঁর 'প্রবাসী, চল্ রে দেশে চল্' গানটি রচনা করেন। প্রবাসে যতই দিন যায়, দেশের জন্য তত মন উতলা হতে থাকে।

এই সময়ে বড়মামা কৃষ্ণগোবিন্দ সপরিবারে লণ্ডনে এলেন। অতুল যারপরনাই আনন্দিত। মামা-মামীর কাছে প্রায়ই চলে যান, হাসি, গান, আড্ডায় দিন কাটতে থাকে। মামাতো বোনেদের মধ্যে হেমকুসুমের এসরাজ, পিয়ানো ও বেহালা বাদন তাঁকে টানে বেশি। তা ছাড়া ওঁর সুমিষ্ট কণ্ঠের গানও ভারি মধুর। এই সুরের সেতু ধরেই ধীরে ধীরে দুজন কাছাকাছি আসতে থাকেন। সে যাত্রা কিছুদিনের মধ্যেই মামার পরিবার দেশে ফিরে এলেন। এবারে আবার অতুলপ্রসাদ নিঃসঙ্গ! মন দিলেন পড়াশুনায়।

অবশেষে ১৮৯৪ সালে অতুলপ্রসাদ ব্যারিস্টারী পাশ করলেন। এবার দেশে ফেরার পালা। ১৮৯৫ সালে দেশে ফিরেই মা হেমন্তশশীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর আশীর্বাদ নিলেন। তারপর সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের (পরে যিনি 'লর্ড' উপাধি পান) সহকারী হিসাবে কলকাতায় ওকালতি শুরু করেন।

প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা যাক, --- The High Court of Calcutta-র ১২৫ বর্ষীয় স্মারক সংখ্যায় (১৮৬২ - ১৯৮৭) মুদ্রিত আছে . . . "The Ecstatic resonance of Atul Prasad Sen's (1896) lyrics is heard in every Bengali home. Again, the poet of 'The song of the ocean' (Sagara Sangeet) in his Vaishnavite melody surrendered completely to the Almighty."

কলকাতার সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষেরা অতুলকে কাছে টেনে নিলেন। ১৮৯৭ (অতুলপ্রসাদের স্মৃতিকথায় ১৮৯৬) সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'খামখেয়ালী সভা'য় তখন বহু গুণীজনের আনাগোনা। সেখানে নতুন সদস্যপদ পেলেন অতুল। হুজুগে ও হুল্লোড়ে মানুষের সভা যখন, ঠাকুরবাড়ির বদান্যতায় সে সভা যেমন সুরসিক সদস্যদের মজাদার অভিনয়ে ও হাস্যকৌতুকে সদাই রসের জোয়ারে ভাসত, তেমনই সভাশেষে অন্দরমহল থেকে নানাবিধ রসালো ভোজ্যবস্তুর জোগানেও তাদের রসনাতৃপ্তিতে কোনও ঘাটতি পড়ত না। এই সভার প্রকৃতি ছিল বাস্তবিক খামখেয়ালি। এখানে সাহিত্য, সঙ্গীত ও নাটকের প্রধান উপাদানই ছিল হাস্যরস ও কৌতুকপূর্ণ উদ্দীপনার রস। রবিঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদ,--- মূলতঃ এঁরা সভা আলোকিত করলেও, অবনীন্দ্রনাথ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, মহারাজ জগদীন্দ্র নারায়ণ রায়, রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী এবং লোকেন্দ্রনাথ পালিত প্রমুখ সাহিত্যিকেরাও এই সভার শোভাবর্ধন করতেন। দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যকৌতুক অতুলপ্রসাদকে বড়ই আনন্দ দান করত। সেখানে হাসির গানের কোরাসে রবিঠাকুর ছিলেন অন্যতম। যেমন দ্বিজেন্দ্র যখন ধরতেন--- 'হতে পাত্তেম আমি মস্ত বড় বীর',--- রবীন্দ্রনাথ বলতেন,--- 'তা বটেই তো, তা বটেই তো'! দ্বিজেন্দ্র যখন গাইতেন, 'নন্দলাল তো একদা একটা করিল ভীষণ পণ', রবিঠাকুর ধরতেন---- 'বাহারে নন্দ, বাহারে নন্দলাল'! এই সভা এক একবার ঘুরে ঘুরে এক একজন সদস্যের বাড়িতে বসত। কোন কোন দিন সভা শেষ হত গভীর রাতে, কখনও কখনও সভাসদেরা পরদিন সকালে ফিরতেন। এইসব সভার খেয়ালী শিল্পীদের সৃষ্টিশীলতায় বাংলার সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প ও নাট্যাভিনয় এক অভাবনীয় স্তরে উন্নীত হয়েছিল! পরে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে চলে যাওয়ায় 'খামখেয়ালি সভা' বন্ধ হয়ে যায়।

এই সময় থেকেই অতুলপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহধন্য হয়ে ওঠেন। জোড়াসাঁকোয় তিনি প্রায় নিয়মিত যেতেন। কবিও তাঁর অপেক্ষায় অধীর থাকতেন।

এর পর থেকে অতুলের জীবনের বাঁক অন্য খাতে বইল। ব্যারিস্টার অতুলপ্রসাদ যদিও কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেছিলেন, কিন্তু এখানে তাঁর পসার জমাতে বিশেষ বেগ পেতে হচ্ছিল। মামাতো বোন হেমকুসুম তাঁকে নানাভাবে চেষ্টা করেও উৎসাহিত করতে পারছিলেন না। এরই মধ্যে ১৮৯৭ সালের ১৯শে ডিসেম্বর দুর্গামোহন দাশ মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যু অতুলকে একেবারে বিধ্বস্ত করে দিল। দুর্গামোহনের দ্বিতীয় বিবাহের পর আত্মীয়-বন্ধুরা তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন, ফলে হেমন্তশশী ও বোনেদের দায়িত্বভার অতুলের উপরেই এসে পড়ল। এবারে পসার না জমলেই নয়। কয়েকজন শুভাকাঙ্খীর পরামর্শে তিনি চলে গেলেন রংপুর, যদিও মন পড়ে রইল কলকাতার কৃষ্টিবলয়ে। মাঝে মাঝেই চলে আসতেন কলকাতায়।

এমন একটি সময়ে তাঁর জীবনে এল বিরাট ঝড়। অতুলপ্রসাদ ও হেমকুসুম স্থির করলেন তাঁরা বিবাহ করবেন। মামাতো-পিসতুতো ভাইবোনের এ হেন সম্পর্ক নিয়ে আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে ও সমাজে অত্যন্ত নিন্দার ঝড় উঠল, এমন কি মা হেমন্তশশীও অত্যন্ত রুষ্ট হলেন, মত দেওয়া তো দূরের কথা! ওদিকে বড়মামা কৃষ্ণগোবিন্দর পরিবারও এ বিয়ে মেনে নেবেন না। হেমকুসুম সে সময়ে আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে তাঁর মা কে রাজী করালেন। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। হিন্দু আইনে এ বিয়ের কোনও পথ নেই। বৃটিশ আইনেও নয়। অতুলও ধর্মান্তরিত হবেন না। শেষে সত্যেন্দ্রনাথ সিংহ পরামর্শ দিলেন, বিলেতের স্কটল্যাণ্ডে গ্রেটনাগ্রীণ গ্রামে ভাই-বোনের এ রকম বিয়ের আইন আছে, সেখানে চলে যেতে। এ পরামর্শ মেনে অতুল ও হেমকুসুম আবার সাগর পাড়ি দিয়ে চললেন বিলেত। এবারে স্কটল্যাণ্ডের আইন মোতাবেক ১৯০০ সালে ওখানকার ওল্ড পারিশ চার্চে নির্বিঘ্নে বিবাহ সম্পন্ন তো হল ; কিন্তু আত্মীয়-পরিজন বর্জিত, সমারোহ হীন, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে এ পরিণয় তাঁদের মনে বড় অভিমান ও দুঃখের সঞ্চার করল। তাঁরা আর দেশে না ফিরে বিলেতকেই তাঁদের গার্হস্থের নর্মভূমি, কর্মভূমি ও কাব্যের লীলাভূমি মেনে সেখানেই থাকা মনস্থ করলেন। মা হেমন্তশশীর কাছ থেকে কোনও পত্র এল না, এল না অন্য কারুর কাছ থেকে কোনও প্রথাগত শুভেচ্ছাবার্তাও। এ নিদারুণ ব্যথাও অতুলপ্রসাদের করুণ সুরের উৎস হয়ে উঠল।

কবির লণ্ডনের বাড়ী। সৌজন্যে উইকিপেডিয়া।

এত ব্যথার মধ্যেও সুখের হাসি ফুটল, পরের বছর যখন হেমকুসুমের কোল আলো করে যমজ সন্তান দিলীপকুমার ও নিলীপকুমারের জন্ম হল। ততদিনে অতুল সমস্ত উদ্যম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তাঁর আইন প্র্যাকটিসে। এবারে ছেলেদের মুখ চেয়ে ব্যবসার জন্য নিরলস পরিশ্রম করে চললেন। তবুও পসার কিছুতেই জমছিল না। ওদিকে নিরানন্দ হেমকুসুমও। স্বামীর কর্মক্ষেত্রে ব্যর্থতা, আত্মীয়দের নির্লিপ্ত মনোভাব, তার উপর বিলেতের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় শিশুপুত্রদের কষ্ট তাঁকেও ব্যথিত করে তুলল। সংসার চালাতে গিয়ে একে একে সব অলংকার বিক্রী করে দিতে থাকলেন। এরই মধ্যে সাত মাস বয়সে মাত্র কয়েকদিনের জ্বরে নিলীপকুমারের মৃত্যু হল। এই ঘটনায় দুজনেই প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেলেন, সব উৎসাহ নিভে গেল।

এই সময় তাঁদের পাশে দাঁড়ালেন বিপিনবিহারী বসু ও অতুলের এক মুসলমান বন্ধু ব্যারিস্টার মমতাজ হোসেন। মূলতঃ মমতাজ হোসেনের পরামর্শেই অতুলপ্রসাদ দেশে ফেরা মনস্থির করেন।

কলকাতায় অতুলপ্রসাদের মাসতুতো ভাই শিশিরকুমার দত্ত ছাড়া আর কেউই তাঁদের স্বাগত জানাতে এলেন না। কিছুদিন কলকাতায় কাটিয়ে পরিবার, আত্মীয়বর্গের কাউকে সহায় না পেয়ে সপরিবারে মমতাজ হোসেনের কথামতো অওধের লক্ষ্ণৌতে চলে এলেন।

আবার জীবনপথের মোড় ঘুরল। এখানে লক্ষ্ণৌ সম্বন্ধে কিছুটা অবতারণার প্রয়োজন আছে। লক্ষ্ণৌ নবাবের দেশ, বিবর্তনের দেশ, টপ্পা-ঠুংরী-গজলের দেশ। এই নগরীর পুরনো নাম 'লক্ষ্ণাবতী'। কথিত আছে, রামচন্দ্র অযোধ্যায় সিংহাসনে বসার পর লক্ষ্মণ গোমতী নদীর তীরে এই প্রাচীন নগরীর পত্তন করেন। তাই এই নাম। অনেকের মতে 'লক্ষণাবতী' থেকে 'লক্ষ্ণৌটি', তার থেকে এই 'লক্ষ্ণৌ' নাম। ইতিহাস একে সূর্যবংশীয় রাজত্বের সময়ের নগরী বলে দাবী করে। ১৩৫০ এর পর থেকে অওধ প্রথমে দিল্লী সুলতানদের, পরে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, লক্ষ্ণৌ ছিল এখানকার রাজধানী। ১৮৫৬তে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থানীয় শাসন বাতিল করে এবং ওয়াজেদ-আলি-শাহকে গদিচ্যুত করে লক্ষ্ণৌএর দখল নেয়। সমগ্র অওধ প্রদেশের সাথে আগ্রার অন্তর্ভুক্তি হয়ে 'সংযুক্ত প্রদেশ' তৈরি হয়, যা ১৮৫৭ সালে বৃটিশ রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৭ শে ভারতের স্বাধীনতার পর সংযুক্ত প্রদেশের নাম হয় উত্তরপ্রদেশ, রাজধানী থাকে লক্ষ্ণৌই। লক্ষ্ণৌ শহর বরাবরই সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের পীঠস্থান বলে পরিচিত। এখানকার নবাবরা চিরকালই কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। চতুর্থ নবাব আসফ-উ-দ্দৌলার সময় থেকে লক্ষ্ণৌ এর শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। বদান্য নবাব বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। লক্ষ্ণৌ এর বিখ্যাত রেসিডেন্সী এ সময়েই তৈরি হয়। বেশ কিছু ইমারত নিয়ে তৈরী এই রেসিডেন্সীই তৎকালীন বৃটিশ রেসিডেন্ট জেনারেলের বাসস্থান ছিল। এই সময় থেকেই নানা প্রাসাদ, তোরণ, বাগান ও সেতু নির্মাণে লক্ষ্ণৌ শহর সুশোভিত হয়ে উঠতে থাকে। এখানকার শেষ নবাব ওয়াজেদ-আলী-শাহ ; ---যিনি অত্যন্ত কলারসিক, নাট্যামোদী এবং সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং একই সঙ্গে ঠুংরী গান রচনার জন্যও ইনি বিখ্যাত ছিলেন। কত্থক নাচের প্রসিদ্ধির পিছনেও এই নবাবের যথেষ্ট অবদান ছিল। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর বিধ্বস্ত নগরী নতুনভাবে গড়ে ওঠে। এখানকার নানা ভবন, কুঠিবাড়ি সব ইংরেজদের ক্লাব, অফিস ও সার্কিটহাউসে রূপান্তরিত হয়। নতুন নতুন রাস্তা, দোকান, কোর্ট-কাছারি, অফিস কোয়ার্টার্স ইত্যাদি তৈরি হতে থাকে। জিলানখানা গেটের ভগ্ন ভিতের উপর তৈরি হয় জিমখানা ক্লাব বিল্ডিং। তৈরি হয় চারবাগ রেল স্টেশন। এই বিদ্রোহ-পরবর্তী সময়ে রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ইংরেজদের সুনজরে পড়েন। ইনি সিপাহী বিদ্রোহের আগে থেকেই লক্ষ্ণৌতে বসবাস করতেন। এই নব নগরায়ণের কারীগর ছিলেন এই রাজা। তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। একসময় রাজনারায়ণ বসু কিছুদিন তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। সে সময়েই শ্রী বসু লক্ষ্ণৌএর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করে যান।

এই নতুন গড়ে ওঠা শহরে ১৯০২ সালে অতুলপ্রসাদ সপরিবারে ভাগ্যান্বেষণে এসে উপস্থিত হলেন । তবে এবার বুঝি একটু হলেও আশার আলো দেখা যেতে লাগল। ব্যারিস্টার অতুলপ্রসাদ লক্ষ্ণৌ বার অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য হলেন। প্র্যাকটিসে মন বসালেন। ইংরেজ আমলে লক্ষ্ণৌতে প্রথম জুডিসিয়াল কমিশনার্স কোর্ট স্থাপিত হয়, যা পরে চীফ কোর্টে রূপান্তরিত হয়। হাইকোর্ট এলাহাবাদেই থাকে।

এখানে বিপিন বিহারী বসু এবং মমতাজ হোসেনের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় অতুলপ্রসাদ স্বাধীনভাবে প্র্যাকটিস শুরু করলেন। এ রকম বিশেষ বন্ধুর মধ্যে একজন ছিলেন নগেন্দ্রনাথ ঘোষাল। কয়েকদিনের মধ্যে অতুল, শ্রীপাল সিং এর বাড়ি, ভাড়ায় নিয়ে থাকতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে পসার জমতে শুরু করল। বন্ধুদের পরামর্শে তিনি উর্দু ভাষা শিখতে শুরু করলেন, যা স্থানীয় ভাষা হিসাবে তো বটেই, বিশেষ করে কোর্ট-কাছারির ভাষা হিসাবেও শেখা খুব প্রয়োজনীয় ছিল।

প্রচুর অর্থ সমাগম না হলেও অতুলপ্রসাদ ও হেমকুসুম এখন মোটামুটি স্বচ্ছলভাবে সংসার চালাতে সক্ষম হলেন। হেমকুসুমেরও সংসারে শৈল্পিক ছোঁওয়া লাগতে শুরু করল, সেই সঙ্গে তাঁর মিঠে গলায় সুরও খেলতে থাকল। উত্তর ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা বাংলার থেকে বেশ ভিন্ন হলেও অতুলপ্রসাদ অভিন্নভাবে সে সংস্কৃতি ও সভ্যতার সাথে মিশে গেলেন। শ্রী রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়--- “যে উদারপ্রাণে অতুলপ্রসাদ সেন এদেশের সামাজিক মিষ্টালাপে আপনাকে ঢালিয়া দিয়া এদেশবাসীর সহিত নিবিড় আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার কবি-জীবনের রসপ্রেরণা হইয়াছিল।”

ইংরেজ আমলে দক্ষিণারঞ্জনের পর লক্ষ্ণৌকে দ্বিতীয়বার সাজিয়ে তোলার কাজ শুরু হয়। এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেন বাবু গঙ্গাপ্রসাদ ভার্মা। তিনি প্রথমে লক্ষ্ণৌ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের মেম্বার ও পরে ঐ বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান হন। কৃতজ্ঞ অতুলপ্রসাদ ওঁর এই কাজে নিজেকে উজাড় করে দিলেন। লক্ষ্ণৌ সেজে উঠতে লাগল নানা সুদৃশ্য ইমারত, পার্ক, পাঠাগার প্রভৃতিতে। এ কাজে গঙ্গাপ্রসাদের সঙ্গে অতুল এতটাই নিজেকে নিয়োজিত করে ফেললেন যে, লক্ষ্ণৌ শহরে অতুলপ্রসাদকে সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। প্রবাসে থেকেও তাকেই দেশ বলে মেনে নেওয়াতে কোনও কুণ্ঠাবোধ ছিল না। তিনি বলতেন, ‘ভারতে বাস করে ভারতবাসী নিজেকে পরবাসী কী করে বলবে?...এ দেশও আমার দেশ।’

বাঙালি দেশে বিদেশে যেখানেই গেছে, তার সাংস্কৃতিক শিকড়কে সে ভুলতে পারে নি। ফলে সে-সব জায়গায় তারা গড়ে তুলেছে গ্রন্থাগার, সভা-সমিতি, নাট্যমঞ্চ প্রভৃতি। লক্ষ্ণৌতে বাঙালি সংস্কৃতির ধ্বজাধারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, বিমল চন্দ্র ঘোষ, বিভূতিভূষণ ঘোষ, চারুচন্দ্র বসু, বিপিনবিহারী বসু প্রমুখ। তাঁরা ১৮৯২ সালে সেখানে 'বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগার' স্থাপন করেন। পরবর্তীতে এই গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে ‘বঙ্গীয় যুবক সমিতি’। এর প্রথম সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও প্রথম সেক্রেটারী ছিলেন ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ। ১৯০২ সাল থেকে এর স্বর্ণযুগ শুরু হয়, কারণ, এই সময় থেকেই অতুলপ্রসাদ এর সভাপতি হন। অনেকেই এই সময়কে সমিতির 'অতুলপ্রসাদ যুগ' বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন। অতুলপ্রসাদ আমৃত্যু এই পদ অলঙ্কৃত করে থেকেছেন।

উত্তরপ্রদেশের নবাবী শহরে প্রচুর বাঙালির বাস তখন,--- সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে গুণমানের কদর করতে জানেন। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগ ছিল। রাষ্ট্রনীতিগত

যোগাযোগেও তিনি নাম রেখেছিলেন, ---গোখলের অনুবর্তীরূপে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি লিবেরাল ফেডারেশনেও যোগ দেন ও পরে এর বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

১৯০৫ সাল। অতুলপ্রসাদ এখন লক্ষ্ণৌএর সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যারিস্টার। সে সময়ে বঙ্গভঙ্গের উত্তাল ঢেউয়ে সারা বাংলা টলমল। সে বছর কাশীতে কংগ্রেসের অধিবেশন বসবে। গঙ্গাপ্রসাদ ভার্মা, গোকরণনাথ মিশ্র, বিশ্বেশ্বরনাথ শ্রীবাস্তব, মমতাজ হোসেন প্রমুখেরা মিলে অতুলের কাছে দরবার জানালেন, তাঁকেই এই কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির নেতৃত্ব দিতে হবে। এঁদের কাছে অতুলের কোনও আপত্তিই টিকল না। এই অধিবেশনে সেবার সভাপতিত্ব করেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে। সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় হল বঙ্গভঙ্গ। গোখলে এ প্রসঙ্গে বাঙালির দেশপ্রেম ও আন্দোলন-শক্তির উল্লেখ করে বলেন, ... 'সমগ্র ভারতবর্ষ এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলা দেশের কাছে ঋণী।' গোখলের বলিষ্ঠ ভাষণে, অসামান্য ব্যক্তিত্বে ও অপ্রমেয় প্রজ্ঞায় অতুল মুগ্ধ হলেন। গোখলের সঙ্গে অতুলের সেই প্রথম পরিচয়। বঙ্গীয় যুবক সমিতি থেকে গোখলেকে অভ্যর্থনা জানানো হয়।এরপর গোখলে বহুবার লক্ষ্ণৌতে অতুলপ্রসাদের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। অতুলপ্রসাদ গোখলের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন।

লক্ষ্ণৌএর সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যারিস্টার A.P. Sen। সৌজন্যে উইকিমেডিয়া।

অতুলের মনে পড়ে যায়, কিছুদিন আগেই কলকাতা যাওয়ার সময়ে হাওড়া স্টেশনে নেমেই বেশ কিছু ছেলেকে তাঁরই লেখা স্বদেশী গান গাইতে শুনেছেন। একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এ গান কার লেখা, ভাই?' সে উত্তর দিয়েছিল,--- 'কেন, এ তো অতুলপ্রসাদ সেনের, আপনি জানেন না?' আবার একদিন গঙ্গার ধারে দেখেন, ---"দেশপ্রেমিকেরা গান গাহিতে গাহিতে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছেন বঙ্গবিচ্ছেদের অভিশাপ ক্ষালন করিবার জন্য ; শোভাযাত্রার সর্বপ্রথমে একটি অল্পবয়স্ক বালক একজন স্থূলদেহীর স্কন্ধে চড়িয়া হাত তুলিয়া সুললিত কণ্ঠে গাহিতেছে,--- 'বাংলার মাটি, বাংলার জল', আর সকলে সহস্রকণ্ঠে সে গানের পুনরাবৃত্তি করিতেছে। ....রবীন্দ্রনাথও নতশিরে সে স্নানযাত্রায় যোগ দিয়াছিলেন।" এই দৃশ্য অতুলের চোখে জল এনে দিয়েছিল। যুবকেরা তখন গাইত 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে'। বাংলার এ অদম্য যুবশক্তির পরিচয় পেয়ে অতুলপ্রসাদও বিস্মিত হয়েছিলেন।

তাঁর জীবনের এই ব্যাপ্তি নিয়ে বলতে গেলে শেষ হবে না এ আলেখ্য! তাই এ প্রসঙ্গ সংক্ষিপ্ত রেখেই এগোন যাক অতুলপ্রসাদের চিরব্যথিত, নিঃসঙ্গ একাকী জীবনের পথ চলার বিবরণে।

যশস্বী অতুলপ্রসাদের পারিবারিক জীবন এতই বেদনাদীর্ণ, যে তা বলতে গেলেও দ্বিধাবোধ হয়। যদিও অমন ব্যক্তিত্বময় মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের কথা বাইরে না আসাই শ্রেয়, কিন্তু তাঁর কাব্য-সঙ্গীতে অমৃত সুধার উৎস সম্বন্ধে আলোকপাত না করলে তাঁর জীবনালেখ্যর প্রতি সুবিচার করা হয় না। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী অশেষ সৎ গুণের আধার হওয়া সত্ত্বেও ভবিতব্যকে খণ্ডাতে পারেন নি। শিক্ষায়, সৌজন্যে, মমত্বে, দানশীলতায়, রুচিতে, কাব্য-সঙ্গীত ও শিল্পের নৈপুন্যে দুজনেই অমিত গুণের অধিকারী ছিলেন। তবুও দাম্পত্য জীবনে তাঁদের সুখের মুখ দেখা হল না।

সত্যপ্রসাদ সেনের ডায়েরীতেও এ ব্যাপারের উল্লেখ আছে,--- 'মা অতুলের কাছে থাকতে এলে, এই সময় অতুলের জীবনে মস্ত পরীক্ষা আরম্ভ হইল।'

শ্রীপাল সিং এর বাসাবাড়ি ছেড়ে কিছু মাসের মধ্যেই অতুলপ্রসাদ কেশরবাগে একটি কম্পাউন্ড ঘেরা সুদৃশ্য বাংলোয় উঠে আসেন, যদিও তখনও তাঁর বিরাট আয় ছিল না তবে স্বচ্ছলতা এসেছে । ততদিনে মা হেমন্তশশীর বয়স হয়েছে, তিন কন্যাই বিবাহিত। অতএব মায়ের ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে এককথায় নিজের কাছে এনে রাখলেন মাতৃভক্ত অতুল। তাঁর মাতৃভক্তি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অতুলপ্রসাদের মাসী (যদিও অতুলের থেকে বয়সে ছোট ছিলেন) সুবালা দেবী বলেছেন, 'তাঁহার মাতৃভক্তি আশ্চর্য দেখিয়াছি। জীবনে পঞ্চাশ বৎসরের অধিক তিনি মায়ের স্নেহ ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু শিশুকাল হইতে এই বয়স অবধি কখনও মায়ের মুখের উপরে কথা বলিতে শুনি নাই।'

হেমন্তশশী আসার পর বাড়িতে নিয়মিতভাবে উপাসনার ব্যবস্থা হল। প্রতি রবিবার উপাসনা হতে লাগল, তখন অতুল ও হেমকুসুম দুজনেই গান করতেন। হেমন্তশশীর ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়ে অতুল কীর্তনের ব্যবস্থাও করেছিলেন। ধীরে ধীরে মার প্রতি অতুলপ্রসাদের আনুগত্য যেমন সীমাহীন হয়ে উঠতে লাগল, তেমনই হেমন্তশশীরও সন্তানের পর অসীম প্রভাব বাড়তে লাগল। অসামান্য ব্যক্তিত্বময়ী ও তেজস্বিনী হেমকুসুমের মনে তা অসন্তোষের আগুন ছড়াতে শুরু করল।

এর মধ্যে কৃষ্ণগোবিন্দ (স্যর কে.জি.গুপ্ত) লক্ষ্ণৌয়ে এলে অতুলপ্রসাদ তাঁকে যথাসাধ্য আপ্যায়ণ করে নিজের কাছে এনে রাখলেন। হেমকুসুমও ততদিনে বাবার প্রতি নরম হয়েছেন। কিছুদিন পরে ১৯০৭ সালে স্যর কে.জি.গুপ্ত কর্মসূত্রে বিলেতে চলে যান।

১৯১১তে অতুলপ্রসাদের তৃতীয়বারের জন্য বিলেতে যাওয়া। রেওয়া স্টেটের কেস নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যরিস্টার প্রিভি কাউন্সিলে চলেছেন। সঙ্গে হেমকুসুম ও দিলীপকুমার। স্যর কে.জি. তখন সপরিবারে লণ্ডনে। দুই পরিবারে আসা-যাওয়া, থাকা-খাওয়া চলল। দেশে ফেরার আগে অতুল ও হেমকুসুম ইল্যাণ্ডের কাছাকাছি কিছু দেশ বেড়িয়ে এলেন। ১৯১২ র ১২ই জানুয়ারী অতুল কেস জিতে সপরিবার দেশে ফিরলেন।

এর পর থেকেই যা ছিল ধিকি ধিকি তুষের আগুন, তা পরিণত হল অশান্তির দাবানলে। হেমন্তশশীর দ্বিতীয় বিয়ে ও হেমকুসুম-অতুলের অসম বিয়ে এই পারিবারিক জীবনের করুণ পরিণতির কারণ বলা যেতে পারে। হেমন্তশশীর দ্বিতীয় বিয়েতে যেমন আত্মীয়-স্বজনেরা সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন, একই ভাবে হেমকুসুম ও অতুলের বিয়েও সবার অসন্তুষ্টির কারণ ছিল। অতুলপ্রসাদ দূর বিদেশে নিজের অর্থকষ্টের দিনে কারুর কাছ থেকে সাহায্য পান নি, তবু তাঁর স্বচ্ছলতার দিনে মাকে দূরে ঠেলে রাখতে পারেন নি।--- ওদিকে হেমকুসুমের এত সদগুণের মধ্যেও

তাঁর জেদ ও রাগ তাঁদের সম্পর্কের অন্তরায় হয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু অতুলের সংসারে হেমন্তশশীর প্রবল কর্তৃত্ব তিনি সহ্য করতে পারেন না। এ সবের উপর অতুলপ্রসাদের মামলা সংক্রান্ত একটি অপমানজনক ঘটনাও ইন্ধন জোগানোর ফলে হেমকুসুম ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে অতুলের সমস্ত ওকালতির পোষাক জ্বালিয়ে দেন। অতুল বাড়ি ফিরে ঘটনার আকস্মিকতায় স্তম্ভিত হয়ে যান, তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে যান। সে রাতে আর বাড়ি ফেরেন না। থেকে থেকেই এই অশান্তির কারণে অতুলপ্রসাদ সমস্ত পূর্ণতা ও আনন্দের মাঝেও এক বিরাট শূন্যতা অনুভব করতে থাকেন।

এমনও কতবার হয়েছে যে একই শহরে রয়েছেন, অথচ দুজনে দু প্রান্তে;--সে দার্জিলিং এর শৈলাবাসই হোক, কলকাতার কোলাহল মুখর শহর অথবা লক্ষ্ণৌএর সঙ্গীতমুখর পরিবেশ। এই বিচ্ছেদ-বেদনাবিদ্ধ অবস্থায় আমরা অতুলের মুখে শুনি বিশ্বজননীর প্রতি নিজেকে সমর্পনের গান---

‘আমারে রাখতে যদি আপন ঘরে
বিশ্ব ঘরে পেতাম না ঠাঁই
দুজন যদি হত আপন,
হত না মোর আপন সবাই।’

অথচ এই হেমকুসুমই লক্ষ্ণৌ থাকাকালীন আলাদা থাকলেও ছুটে গেছেন, অতুলের অতিথিদের আপ্যায়ণের ভার তুলে নিয়েছেন নিজে। এ এক বিচিত্র সম্পর্কের যাপনচিত্র!

দুই ‘হেম’ এর এই প্রবল বিরোধে হেমন্তর শেষ বিকেলের মত কুহেলীবিলীন হয় অতুলের ফুলের বাগান। যতই অতুল একা হতে থাকলেন, ততই করুণ বাষ্পে মাখা বাণীর নিঃসরণ ঘটতে থাকল রক্তঝরা হৃদয়ের নিভৃতস্থল থেকে, ---যত আঘাত, তত বিকাশ ; যত দহন, তত সৃষ্টি! সে জন্যই বুঝি গ্যেটে কে উদ্ধৃত করে দিলীপকুমার রায় লিখেছেন,--- ‘গভীর দুঃখ পাওয়া সার্থক যদি সে-দুঃখে একটি গানও ফুটে ওঠে আঁধারে তারার মতো।’ সত্যিই অতুলপ্রসাদের গানের আকাশটি নক্ষত্রখচিত ছিল।

১৮৯৭এ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের যে সূত্রপাত, সে সম্পর্ক আমৃত্যু দুজনে লালন করেছেন। সেই সম্পর্কের ক্ষুদ্র চারাগাছটি দুজনের পারস্পরিক শ্রদ্ধার ও স্নেহের জলসিঞ্চিত হয়ে ক্রমে পত্র-পুষ্প শোভিত এক মধুর বৃক্ষের রূপ ধারণ করেছিল।

প্রতি গ্রীষ্মে অতুল কবির কাছে যেমন লক্ষ্ণৌএর রসাল ফল সফেদা দশেরী আমের ঝুড়ি পাঠাতেন নিয়ম করে, তেমনই মাঝে মাঝেই কাজের ফাঁকে আবার শান্তিনিকেতনে কবির অতিথিও হতেন। অতুলের যেমন অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল কবির প্রতি,- রবির স্নেহের ফল্গুধারার প্রবাহও তেমনই অবাধ ছিল এই বয়োঃকনিষ্ঠের প্রতি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘পরিশেষ’ বইটি অতুলপ্রসাদকেই উৎসর্গ করেন।

১৯১৪ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ হিমালয় ভ্রমণ সেরে রামগড়ে এসেছেন। সেখানে তাঁর কেনা বাড়ি ‘হৈমন্তী’তে অনেক আত্মীয়-পরিজন তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছেন। তবু তৃষ্ণার্ত রবি অতুলকে লিখলেন,--’ গ্রীষ্মের আতিশয্যে সকলেই মেঘের জন্য লালায়িত। আমি ভাবিতেছি অতুল কবে আসিয়া আমাদিগকে স্নিগ্ধ করিবেন।’ কবির আমন্ত্রণে আপ্লুত অতুল লক্ষ্ণৌ থেকে ছুটে গেলেন। সেখানে তখন দিনেন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথও রয়েছেন। একদিন সূর্যোদয়ের আগেই ঊষালগ্নে একটি পাথরের উপর বসে রবিঠাকুর হিমালয়ের সৌন্দর্য্যে মোহিত হয়ে গুনগুন করে গাইছেন--’এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে, সুন্দর।’ অতুলপ্রসাদ আড়াল থেকে সে অবিস্মরণীয় গীত রচনা ও সুরসৃষ্টির সাক্ষী থাকলেন।

১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে রামগড়ে তোলা ছবি। বাঁ দিক থেকে - রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ সেন ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সৌজন্যে অনুশীলন.অর্গ।

আগেই বলেছি লক্ষ্ণৌ ঠুংরি-দাদরা-গজলের দেশ। এখানে তাই হিন্দুস্থানী সঙ্গীত সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক।

'ঠুংরিগান' বা 'ঠুমরী', --- ভাবপ্রধান, শৃঙ্গার রসাত্মক, চপলতাবর্জিত, ক্ষুদ্র আকারের একধরণের গায়নশৈলী। এ গানের মূল উদ্দেশ্য বিধিবদ্ধ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মধ্য থেকে ছুট বা অবসর নেওয়া। বাণী এবং সুরের মিলনে লক্ষ্ণৌ বা বারাণসীর যে ঠুংরি, তার নাম পূর্বি। পাঞ্জাবের সুরপ্রধান গান পাঞ্জাবি। 'খেয়াল' গান হচ্ছে শাস্ত্রীয় রাগপ্রধান গান, যা নানা বোলতান, আলাপ, বিস্তার ও গায়কী দ্বারা গাওয়া হয়। 'কাওয়ালী' থেকে 'খেয়াল' শব্দটি এসেছে। 'গজল' --- ফারসী বা আরবী ভাষায় রচিত কবিতা যা শৃঙ্গার রসপ্রধান, প্রেম ও বিরহ ভাবকে প্রকাশ করাই যার উদ্দেশ্য! 'দাদরা' --- হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে ব্যবহৃত হালকা চালের তালবিশেষ। টপ্পা গানও শৃঙ্গার রসের চঞ্চলপ্রকৃতির গান। এই শব্দের একটি অর্থ লম্ফ, আর একটি অর্থ সংক্ষেপ। বলা হয়, মধ্য এশিয়া থেকে আসা যাযাবর গোষ্ঠীর এক উটচালক শোরি মিয়া যাযাবর গানের সাথে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের সংমিশ্রণে এই গানের সূচনা করেন। নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্ র সৃষ্টি 'ঠুংরি'কে বাংলা সঙ্গীতে প্রথম প্রবর্তন করেন অতুলপ্রসাদ। 'খেয়াল' এর পরেই ঠুংরির স্থান।)। নানা রাগের সংমিশ্রণে এর সৃষ্টি। শুধুমাত্র স্থায়ী ও অন্তরায় সংক্ষিপ্ত শব্দের মধ্যে যে মাধুর্য পাওয়া যায় তা অতুলনীয়। 'কদরপিয়া', 'লালনপিয়া', 'আখতারপিয়া' ইত্যাদি ছদ্মনামে ওস্তাদেরা এসব ঠুংরির স্রষ্টা ছিলেন। নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্ 'আখতারপিয়া' নামে সৃষ্টি করেছিলেন ঠুংরি। ---- 'কী আর চাহিব বল', 'ওগো নিঠুর দরদী', 'যাব না, যাব না, যাব না ঘরে' ।---এগুলি অতুলপ্রসাদের ঠুংরি গানের উদাহরণ। তিনি খেয়াল, দাদরা ও ঠুংরির প্রচলন করে বাংলা গানকে এক অন্য মাত্রায় উন্নীত করেছেন। এই ধারাগুলি মিলে বাংলা গানের 'রাগাশ্রয়ী' ধারার প্রচলন হয়। রাগাশ্রয়ী গানের মধ্যে 'বঁধু, ধর ধর মালা পর গলে', 'তবু তোমায় ডাকি বারে বারে' এগুলি পাই। ধ্রুপদ ও কীর্তনের অপূর্ব সংমিশ্রণে 'জানি জানি হে রঙ্গরাণী' গানটি পাই। অতুলপ্রসাদের নিজ কণ্ঠে এটি গীত আছে।

১৯১৫ সাল। লর্ড সিংহ (সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ তখন 'স্যর') তখন লক্ষ্ণৌএ অতুলপ্রসাদের অতিথি। তাঁর ইচ্ছায় ঠুংরী-দাদরার আসর বসল অতুলের বাড়িতে। অতুলের মজলিসী স্বভাবের কারণে

মানুষের সঙ্গ, আড্ডা তাঁর প্রাণ ছিল। গান শুনতে শুনতে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন। উত্তেজিত ও উচ্ছ্বসিত হয়ে শিল্পীকে বাহবা দিতে দিতে কখনও বেসামাল হয়ে পড়তেন। এই যে তাঁর সঙ্গীত-মগ্নতা, এ যেন নিজের নিভৃতের একাকীত্বকে ভুলে থাকা। হৃদয়ের ভিতরে একদিকে উভয়ের প্রতি উভয়ের ভালবাসার পূর্ণ সরোবর, অন্যদিকে বিচ্ছেদে ক্ষত-বিক্ষত হওয়া দীর্ণতার ক্ষরণ!

১৯১৬র গোড়ার দিকে পারিবারিক কারণেই লক্ষ্ণৌ এর প্র্যাকটিস ছেড়ে কলকাতা হাইকোর্টে এসে ব্যারিস্টারী শুরু করলেন। তখন তাঁর বাসস্থান ছিল 'ওয়েলেসলি ম্যানসন'--পার্কস্ট্রীট ও ওয়েলেসলি স্ট্রীটের মোড়ের কাছাকাছি। তিনি আসার কিছুদিন আগেই অমল হোম, সুকুমার রায় প্রমুখরা কিছু বন্ধুদের নিয়ে 'মনডে ক্লাব' নাম দিয়ে একটি গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন। অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তি এই ক্লাবের সদস্য ছিলেন। অজিতকুমার চক্রবর্তী, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, অধ্যাপক কালিদাস নাগ, অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র সেন, সুবিনয় রায়, --আরও যে কত নাম, শেষ করা যায় না। প্রতি সোমবার এই ক্লাবের অধিবেশন হত কোনও এক সদস্যের বাড়িতে। গৌরবের বিষয়, যে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই ক্লাবের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। কবি যেদিন প্রথম আসেন, সেদিন সদস্যদের জন্য 'পয়লা নম্বর' গল্পটি লিখে এনে সবাইকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। অতুলপ্রসাদ কলকাতায় এসে এই ক্লাবের সদস্য হলেন। তাঁর বাড়িতেও অধিবেশন বসত, সঙ্গের বিশেষ আকর্ষণ ছিল তাঁর বাড়ির জলযোগ। এ ছাড়াও বহুজনের বাড়িতে এই আনন্দসভা অনুষ্ঠিত হত, যাতে সুকুমার রায় ও সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখও যোগ দিয়েছেন।

অমল হোল, সুকুমার রায় প্রমুখদের প্রতিষ্ঠিত মনডে ক্লাবের একটি গ্রুপ ফটো। সৌজন্যে থ্রেডারউইকি.কম।
প্রথম সারিতে বাঁদিক থেকে - সুবিনয় রায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, অতুলপ্রসাদ সেন, শিশিরকুমার দত্ত, সুকুমার রায়। মাঝের সারিতে বাঁদিক থেকে - যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অমল হোম, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জীবনময় রায়। পিছনে দাঁড়িয়ে বাঁদিক থেকে - হীরণ সান্যাল, অজিতকুমার চক্রবর্তী, কালিদাস নাগ, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র সেন, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী।

১৯১৬ র লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদানের জন্য অতুলপ্রসাদকে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ লোক পাঠিয়ে লক্ষ্ণৌতে ফিরিয়ে নিয়ে যান। সে সম্পর্কে অমল হোম লিখেছেন, "'সেবার লখনৌ কংগ্রেসে

গিয়ে বুঝলাম অতুলপ্রসাদ লখনৌ সহরবাসীর কত প্রিয়। সত্যই তিনি লখনৌর মুকুটহীন রাজা ছিলেন। ধনী-দরিদ্র, মডারেট-এক্সট্রিমিস্ট, রাজা-নবাব, রইস-রায়ৎ, অধ্যাপক-স্কুলমাস্টার, উকিল-ব্যারিস্টার, হিন্দু-মুসলমান--সকল শ্রেণীর সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর অদ্ভুত প্রভাব।".....তিনি কারও কাছে 'এ.পি. সেন', কারও 'ভাই সাহেব', কারও 'ভাই দাদা', কারও 'অতুলদা', আবার কারও বা 'সেন সাহেব'।...... .. "সাম্প্রদায়িকতা হতে মুক্ত মানুষ আজকের দিনের পলিটিক্যাল ক্ষেত্রে দেখা পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অতুলপ্রসাদকে এই ভাব থেকে মুক্ত দেখেছি।" হিন্দু-মুসলিমের দাঙ্গা লেগেছে শহরে,--- ছুটে গেছেন অতুলপ্রসাদ তা থামাতে। শান্ত হতে বলছেন সবাইকে। ঘরে ফিরে এসে লিখলেন,---

'পরের শিকল ভাঙিস পরে,
নিজের নিগড় ভাঙ রে ভাই...
সার ত্যজিয়ে খোসার বড়াই!
তাই মন্দির মসজিদে লড়াই।
প্রবেশ করে দেখ রে দু'ভাই
---অন্দরে যে একজনাই।'

১৯১৭ সালে পুত্র দিলীপের কাছে খবর পেয়ে হেমকুসুমের ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে তাঁকে লক্ষ্ণৌতে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। কিছুদিন অন্তরঙ্গতায় কাটল। তার সাক্ষী ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের ভাইপো অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। সে রকম কোনও এক সময় সীতাপুরে একটি কেসের কাজে গেছেন, ---কালো মেঘে আকাশ ঢেকেছে, ---অতুল লিখছেন আর সুর তুলছেন ; প্রাণ পাচ্ছে সেই বিখ্যাত গান-- 'বঁধুয়া, নিদ নাহি আঁখিপাতে'! হেমকুসুম সে গান অতুলের কাছ থেকে শিখে নিজেও গাইতেন।

লক্ষ্ণৌ ফিরে কিছুদিনের মধ্যে অতুল মা ও বোনেদের কাছে নিয়ে এলেন। আবার সংসারে অশান্তি শুরু হল। হেমকুসুম আবার ফিরে গেলেন তাঁর ভাড়া বাড়িতে।

সেই বছর থেকেই ব্যারিস্টার হেমন্ত কুমার ঘোষ অতুলপ্রসাদের জুনিয়র হিসাবে যোগ দেন ও আমৃত্যু তাঁর ছায়াসঙ্গী ছিলেন।

অতুল খবর পেয়েছেন, দাদা সত্যপ্রসাদের কন্যা ও কনিষ্ঠ পুত্র মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে মারা গেছেন। তাঁর চিঠির সাথে উল্টোদিকে গান লিখে পাঠালেন,---

'দিয়েছিলে যাহা গিয়াছে ফুরায়ে
ভিখারীর বেশ তাই ;
ফুরায় না যাহা এবার সে ধন
তোমার দুয়ারে চাই।....'

১৯১৯। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডে অতুলপ্রসাদ ক্ষুব্ধ, বিচলিত। ততদিনে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে লিবেরাল ফেডারেশনে যোগ দিয়েছেন। লক্ষ্ণৌ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান পদের নির্বাচনে এই আদর্শবাদী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দৃঢ়চেতা মানুষটি দল বদলে রাজী না হওয়ায় জিততে পারলেন না। তবুও যেখানেই কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছে সেখানেই ছুটে গেছেন। সে সময় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ লক্ষ্ণৌ এসেছেন, তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছেন অতুলপ্রসাদ।

১৯২০ তে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রাথমিক আয়োজন শুরু হল। গোমতীর ওপারে নবাব নাসিরুদ্দীনের বিলাস-কুঞ্জর ভবনটিকে এই কাজের উপযুক্ত করে তোলা হল। এখানেও অতুলপ্রসাদের উদার মনোভাব এপারের পশ্চিমী হাওয়ার মানুষদের সাথে ওপারের বনেদী, রক্ষণশীল সমাজকে মিলিয়ে দিল সহজেই। যা ছিল ক্যানিং কলেজ, তা রূপ নিল বিশ্ববিদ্যালয়ের। এই লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকের এ.পি.সেন হল্ তার মহিমা বহন করছে।

১৯২২ এ চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর দিলীপকুমার রায়ের বাড়িতে নক্ষত্র সমাবেশ--রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, শরৎচন্দ্র ও অতুলপ্রসাদ! ১৯২২-এই প্রথম 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' (যা বর্তমানে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন') এ দেখা হচ্ছে রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেশচন্দ্র রায়ের সাথে। এখানেই দিলীপকুমারের সাথে অতুলপ্রসাদের প্রথম পরিচয়। দিলীপকুমারকে তিনি শোনাচ্ছেন তাঁর দুঃখের সময়ে বাঁধা গান,---

'কি আর চাহিব বল মোর প্রিয়
তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও....'

অথবা, শোনাচ্ছেন,---

'বিধি, আর তো তোমারে নাহি ডরি
আমি পেয়েছি অকূলে আজি তরী।'

এ গান অতুল যার তার কাছে গাইতে বারণ করছেন, কারণ,--- 'এ গান বড় ব্যথার দিনে লেখা'।

এই সময়ে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও একটি কেসের কাজে লক্ষ্ণৌ এসেছেন। তাঁকে মহা সমারোহে অভ্যর্থনা জানাবার পর অতুল তাঁকে নিয়ে এলেন নিজের বাংলোয়। সেখানে নিজে তাঁকে গেয়ে শোনান 'মোদের গরব, মোদের আশা' গানটি। স্যর আশুতোষ শুনে ধন্য ধন্য করেন।

১৯২৩ এর শুরুর দিকে হেমন্তশশী ও হেমকুসুমে আবার বিরোধ। হেমকুসুম সপুত্র চলে গেলেন- প্রথমে এক আত্মীয়ের বাড়ি, পরে ক্যাণ্টনমেণ্ট রোডে ভাড়া বাড়িতে। হেমন্তশশী অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে বললেন, 'আমি বেঁচে থাকতে হেমকুসুমের এ বাড়িতে আর আসা চলবে না!' হেমন্তশশীর জীবিতকালে হেমকুসুম মাত্র একবারই অতুলের গৃহে আসেন।

প্রবাসী বাঙালিদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির আদান-প্রদানের নিমিত্ত ১৯২৩ সালে কাশীতে 'সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ' কাশী নরেশ নামাঙ্কিত প্রাঙ্গনে যে অধিবেশন বসেছিল--তার নাম হয় 'উত্তর ভারতীয় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন' যার সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে অতুল লক্ষ্ণৌ থেকে ছুটে গেলেন। কবিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে গাইলেন বাঙালির সেই মরমী গান--যা তিনি ১৯১৩ সালে কবির নোবেল প্রাপ্তি উপলক্ষে রচনা করেছিলেন, ---

'বাজিয়ে রবি তোমার বীণে
আনল মালা জগৎ জিনে
তোমার চরণতীর্থে আজি
জগৎ করে যাওয়া আসা।'

(মূল গান: 'মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি বাংলা ভাষা')

একবার অতুলপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে যেতে না পেরে কবিকে লিখলেন, '....বঙ্গ সাহিত্য-তীর্থের সর্ব-প্রধান পুরোহিত, ধর্মে সিদ্ধ ও অগ্রণী, সঙ্গীত কুঞ্জের মাধব, বাংলার দুলাল এবং আমার পরম ভক্তিভাজনের চরণে আজ প্রণত হইতেছি। কায়মনোবাক্যে আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা

করি আপনি দীর্ঘায়ু হইয়া দেশের ধর্ম, স্বদেশানুরাগ, সাহিত্য সৌজন্যের নেতৃত্ব পদে অধিষ্ঠিত থাকুন।

কৃপাকাঙ্খী অতুলপ্রসাদ সেন।" ---এই লেখা থেকেই বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথকে অতুলপ্রসাদ কোন শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিলেন!

আবার কবিগুরুও কৌতুক করে স্নেহভাজনকে চিঠি দিচ্ছেন,--- 'প্রিয়বরেষু,
তোমার আম্রাতক পাওয়া গেল। ভোগ শুরু হল। লাগছে লক্ষ্ণৌয়ের টপ্পার মত--নবাবী স্বাদ অল্পটুকুর মধ্যে গন্ধ ও রস আঁট হয়ে আছে! .....'

অতুলপ্রসাদের এই রবীন্দ্রানুরাগের জন্য অনেকে তাঁর কবিতা ও গানে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব খুঁজেছেন। এ প্রসঙ্গে রাজ্যেশ্বর মিত্র বলেন--- "অতুলপ্রসাদের উপর রবীন্দ্র প্রভাব সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। অনেকের মতে এই প্রভাব যথেষ্ট। অবশ্য কাব্য অর্থাৎ লিরিক্সের দিক দিয়ে যদি বিচার করা যায় তাহলে অতুলপ্রসাদের উপর রবীন্দ্রপ্রভাব যে অসামান্য সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। উদাহরণস্বরূপ অতুলপ্রসাদের একটি গানের কয়েকটি কলি উদ্ধৃত করি-

---'রাতারাতি করলে কে রে ভরা বাগান ফাঁকা?
রাঙা পায়ের চিহ্ন শুধু আঙিনাতে আঁকা ; ......
....চাইত যদি দোরে এসে আমার কুসুমগুলি
উজাড় করে দিতাম তবে আপন হাতে তুলি।
পারত কি সে চলে যেতে-- আমায় যেতে ভুলি?

এই রচনায় রবীন্দ্রপ্রভাব সুস্পষ্ট, কিন্তু গানে এটি প্রকাশ পেয়েছে গজল ঢঙে। এইভাবে বহু ক্ষেত্রেই গানের বেলায় অতুলপ্রসাদ যে রীতি অনুসরণ করেছেন, তা রবীন্দ্রনাথ অনুসরণ করতেন না।"

আবার ১৯২৩ সালেই মার্চ মাসে লক্ষ্ণৌ আসবেন রবীন্দ্রনাথ। স্টেশন থেকেই তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার ব্যবস্থা করেছেন অতুলপ্রসাদ। গান রচনা করেছেন এই উপলক্ষে--, বালক-বালিকার দল গাইল--

'এসো হে, এসো হে ভারতভূষণ
মোদের প্রবাস ভবনে
আমরা বাঙালী মিলিয়াছি আজি
পূজিতে ভারত রতনে॥'

অথবা,

'জয়তু জয়তু জয়তু কবি
জয়তু পূরব-উজল রবি,.....'

পাহাড়ী সান্যালের ডাক পড়ল তা কণ্ঠে তুলে নিতে ; --- (অভিনয়ের আঙিনা ছাড়াও যিনি 'best exponent of A. P. Sen's song' বলে পরিচিত)।
পুষ্পবৃষ্টি, সানাইবাদন, গানে ও জয়ধ্বনিতে লক্ষ্ণৌ সেদিন মুখরিত। এমনদিনে হেমকুসুমও অভিমান বুকে চেপে এই আনন্দযজ্ঞে সামিল হতে এলেন। তাঁকে দেখে অতুল উচ্ছ্বসিত হয়ে স্বাগত জানালেন।
অসামান্য এই আতিথেয়তায় রবীন্দ্রনাথ যারপরনাই বিস্মিত, পুলকিত এবং মুগ্ধ। সেদিন অতুলের রচিত একটি গান 'কাঙাল বলিয়া করিও না হেলা' শ্রোতারা রবীন্দ্রনাথের গান বলে ভাবেন। সে কথা জেনে কবিগুরু তাঁকে অনুরোধ করেন, শীঘ্রই যেন অতুল নিজের স্বরচিত গানের একটি বই প্রকাশ করেন। অতুল সেদিন কবিকে একটি হিন্দুস্থানী লোকসংগীত গেয়ে শোনান,----

'মহারাজ কেওড়িয়া খোল
রস কি বুঁদি পড়ে'....

কবি ফিরে গেলে হেমকুসুমও ছেলেকে নিয়ে ফিরে যান তাঁর ভাড়া বাড়িতে। বেদনাহত অতুলের লেখনীতে রচিত হল,---

'ওগো নিঠুর দরদি, এ কী খেলছ অনুক্ষণ!
তোমার কাঁটায় ভরা বন তোমার প্রেমে ভরা মন।'

১৯২৩ এ আবদুল করিম অতুলপ্রসাদের আতিথ্য গ্রহন করেন।

১৯২৪। বিজনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্ণৌ এসেছেন। অতুলপ্রসাদ তাঁকে শোনাচ্ছেন-

'এত হাসি আছে জগতে তোমার বঞ্চিলে শুধু মোরে
বলিহারি বিধি, বলিহারি যাই তোরে।
.....হাসিব হাসাব এই মনে লয়ে রচিলাম কত গান,
সেই গানে আমি কাঁদিলাম কত, কাঁদালেম কত প্রাণ।
যে ডোরে সবার হয় মালা গাঁথা, দিলি ফাঁসি সেই ডোরে!
বলিহারি বিধি, বলিহারি যাই তোরে।'

উৎকর্ষের মানদণ্ডে সময়ও বাঁধা পড়ে। ১৯২৫ এমনই একটি সময়। এই অবিস্মরণীয় কালে প্রবাসের সাহিত্য সাধনায় অর্ঘ্যডালি হিসাবে সে বছরই আশ্বিনের মহালয়াতে অসামান্য সাহিত্য পত্রিকা 'উত্তরা'র সফল আত্মপ্রকাশ। 'উত্তরা' নামকরণটি অতুলপ্রসাদের। কাশীর ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে মুদ্রিত ও লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকা ছিল অতুলপ্রসাদের মানসকন্যা! ---সুরেশ চক্রবর্তীর কথায় --- 'যার জনয়িত্রী বারাণসী, পালয়িত্রী লক্ষ্ণণাবতী!' সুরেশ ছিলেন এর প্রধান দায়িত্বে। সম্পাদক---অতুলপ্রসাদ, যুগ্ম সম্পাদকের একজন---রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ও কোষাধ্যক্ষ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়। দু বছর ধরে অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে প্রভূত পরিমানে অর্থব্যয়ে (যার বেশিটাই অতুলের ভাণ্ডার থেকে) তাকে দিনের আলোর মুখ দেখাতে পেরেছিলেন অতুল। সে সময় বিব্রত অতুল সুরেশকে লিখছেন,--- 'উত্তরার জন্য আমাকে খুব ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে ; যদি জানিতাম আমার উপরেই সমস্ত দায়িত্ব ফেলবে তাহলে একাজে হস্তক্ষেপ করিতাম না।' আবার সেই সঙ্গে চেকও পাঠাচ্ছেন। সে সমস্ত দহনের আঁচ সঙ্গে নিয়েও 'উত্তরা'র সম্পাদকের অভিজ্ঞানটি আমৃত্যু বহন করেছেন অতুলপ্রসাদ।

১৯২৫ এ হেমকুসুম ক্যাণ্টনমেণ্ট রোডের বাড়িতে কিছুদিন থাকার পরে সপুত্র দেরাদুনে চলে যান। সেখানেই থাকতেন। সেখানে একবার টাঙ্গায় উঠতে গিয়ে পড়ে গিয়ে পায়ে জোর চোট পেলেন। জানতে পেরে অতুল ছুটে গেলেন। তাঁকে দেখে হেমকুসুম খুব খুশি হলেন। কাজের জন্য অতুল বেশি দিন থাকতে পারলেন না, চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করে ফিরে এলেন। এর কিছুদিনের মধ্যে ব্যাঙ্কস্ রোড থেকে আউটরাম রোডের এক বাংলোয় চলে এলেন। এবারে আবার মা হেমন্তশশীকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। মা তখন খুবই অসুস্থ। অতুল নিজেও খুব সুস্থ নন। তবু তার মধ্যেই অতুল নিজের গানের বই ' কয়েকটি গান' প্রকাশ করে মা হেমন্তশশীর চরণে উৎসর্গ করেন। এই ঘটনার সাক্ষী ছিলেন অরুণপ্রকাশ। ধীরে ধীরে হেমন্তশশী সব চিকিৎসা বিফল করে ১৯২৫ এর ১২ই মে পরলোকগমন করলেন। মা কে হারিয়ে অতুল শিশুর মত ভেঙে পড়লেন। শেষে কবিগুরুর আহ্বানে শান্তিনিকেতন ও পরে সিমলায় কিছুদিন কাটাবার পর কিছুটা শান্ত হন।

১৯২৫ এর শেষদিকে হেমকুসুম লক্ষ্ণৌতে এসে থাকতে রাজী হলেন। তখনও তাঁর পা ঠিক তো হয়ই নি বরং আরো অকেজো হয়ে পড়েছেন। হেমকুসুমকে পেয়ে অতুলপ্রসাদের মনে খুশির আমেজ।

হেমকুসুম গাড়িতেই বেড়িয়ে আসেন। নামতে পারেন না, তবে বন্ধুজনেরা তাঁর কাছে গাড়িতেই এসে বসে আলাপ করেন, তিনি গান করেন, তাঁরা শোনেন। হেমকুসুম কিন্তু এ.পি. সেনের গানই গাইতেন।

স্ত্রী হেমকুসুম। সৌজন্যে উইকিমেডিয়া।

স্ত্রী হেমকুসুম ও পুত্র দিলীপ। সৌজন্যে আনন্দবাজার।

এর পর ১৯২৬ এ অতুল তাঁর দাদাকে জানাচ্ছেন, হেমকুসুম আবার তাঁর ঘর শূন্য করে চলে গেছেন। অথচ, ওদিকে চারবাগে ৩৩ হাজার টাকা ব্যয়ে তাঁর নতুন বাড়িটি তৈরী হয়ে গেছে, মায়ের নামে নাম দিয়েছেন 'হেমন্ত নিবাস'। মে মাসেই গৃহপ্রবেশ হল, মা ও দেখতে পেলেন না আর গৃহিণীও সঙ্গে থাকলেন না। হেমকুসুম তখন তাঁর অসুস্থ পিতার পাশে, কলকাতায়। আনন্দের মধ্যে বিষাদের ছায়া।

লক্ষ্ণৌতে অতুলপ্রসাদের প্রাসাদোপম বাড়ী 'হেমন্ত নিবাস'। চিত্রশিল্পী চিরঞ্জিৎ ঘোষ। সুরেশ চক্রবর্তীর "অতুলপ্রসাদ সেন" গ্রন্থের ছবি।

অতুলপ্রসাদের জীবিতকালে ঐ সময়েই লক্ষ্ণৌ পুরজনেরা তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে রাস্তা তৈরি করে তাঁর নামাঙ্কিত করেন 'A. P. Sen Road'!

লক্ষ্ণৌ এর সেই স্বর্ণযুগে কে না এসেছিলেন অতুলের সান্নিধ্যে! শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, সরোজিনী নাইডু, লর্ড সিংহ প্রমুখ, কেউ বাদ নেই। ১৯২৫ এ দেখা হচ্ছে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ১৯২৬ এ আবার পাহাড়ী সান্যাল (নগেন্দ্রনাথ) যিনি ১৯১৬ থেকে তাঁর ছাত্র, এবং শচীনদেব বর্মণের সঙ্গে। ১৯২৫ এই আবার মহাত্মা গান্ধী অতুলপ্রসাদের অতিথি হন। অতুলের কাছে তিনি একজন আদর্শ চরিত্রের পুরুষ ছিলেন। সে সময় গান্ধীজী খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন, হেমকুসুমের সেবায় সে যাত্রা সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং তাঁর নিষ্ঠায় মুগ্ধ হন।

শ্রীকৃষ্ণ রতনঝঙ্কারের চিঠি থেকে পাওয়া যায়, ১৯২৪ এ ও ১৯২৫ এ লক্ষ্ণৌতে পরপর নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে, চন্দন চৌবে, শ্রীকৃষ্ণ রতনঝংকার , ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ, রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় , অচ্ছন বাঈ প্রভৃতি গুণীজনেদের সঙ্গীতে লক্ষ্ণৌ মুখরিত হয়ে ওঠে এবং এঁদের সাথে পরিচিত হয়ে অতুলপ্রসাদ সঙ্গীতরসসিক্ত হয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন। আবার বিজয়া রায়ের লেখায় পাই, সত্যজিৎ রায় যখন তাঁর অতুলমামার কাছে থাকতেন, তখন আলাউদ্দিন খাঁ অতুলের বাড়িতে এসে থেকেছেন। আরও যে কত মানুষ তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, সে বলে শেষ করা যাবে না। তিনিও তত নতুন নতুন গান রচনায় সিদ্ধহস্ত হয়েছেন। ১৯২৬ শে ম্যারিস কলেজ অফ মিউজিক এ পণ্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা করেন যা আজকের ভাতখণ্ডে মিউজিক ইনস্টিটিউট। শ্রীকৃষ্ণ রতনঝংকার ভৈরবীতে গাইতেন,--- ‘ভবানী - দয়ানী’, অতুল রচনা করলেন সেই সুরে, --- ‘শুনো, সে ডাকে আমারে’--- ; এইরকম আরো কত। ভাতখণ্ডেজী চলে গেলেন, রয়ে গেলেন তাঁর প্রিয় শিষ্য রতনঝঙ্কার, --- যাঁর লক্ষ্ণৌএর ম্যারিস মিউজিক কলেজের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ মনোনীত হবার পিছনে অতুলপ্রসাদের ভূমিকা ছিল সুবিদিত।

অতুলপ্রসাদ সঙ্গীতের এত বড় পূজারী ছিলেন যে তাঁকেই বোধ করি প্রকৃত ‘কদর দান’ বলা যায়। ঠুংরি গানে বিন্দাদীন, কালকা---এঁরা তাঁর প্রিয় ছিলেন। হারমোনিয়াম বাদক নবাব আলী সাহেব, কণ্ঠশিল্পী ওস্তাদ আহম্মদ খলীফ খাঁ, ছোটে মুন্নে খাঁ, যন্ত্রশিল্পী বরকৎ আলী, সাকায়েত হোসেন খাঁ, তবলাবাদক বীরু মিশ্র--- এঁদের তিনি সমাদরে তাঁর বাড়িতে এনে বৈঠক করাতেন। সুরের যাদু যাঁর কাছে---তিনি ভিখারীই হোন বা মজলিশী গাইয়ে,---তাঁকে সম্মান জানাতে ভুলতেন না।

১৯২৬ এ কানপুরে সাহিত্য সম্মেলনে শরৎচন্দ্র আসতে না পারায় অতুলপ্রসাদই সভাপতিত্ব করেন।

১৯২৭ এর জানুয়ারীতে সত্যদাদা এলেন নতুন বাড়িতে, আনন্দে কাটালেন, তবু সত্যর মনে হল এ বাড়ি যেন পান্থশালা! গৃহের টান নেই।

লক্ষ্ণৌএ ১৯০৯-১০ সালে রামকৃষ্ণ মিশনের গোড়াপত্তন হয়। ১৯২৩ এ বেলুড় থেকে বীরেশ চৈতন্য মহারাজ যান, তখন মঠের জন্য জমি কেনা হয়েছে। পরে ১৯২৬ এ বেলুড় থেকে স্বামী দেবেশানন্দ মহারাজ এলেন লক্ষ্ণৌতে। তিনি দীর্ঘ ১৮ বছর লক্ষ্ণৌতে ছিলেন। অতুলপ্রসাদের সাথে এঁদের যোগাযোগ অত্যন্ত নিবিড় ছিল। মিশনের একটি হল অতুলপ্রসাদ তাঁর বাবার নামে গড়ে দেন, পরে মায়ের নামে শুশ্রূষালয়ও করেন।

১৯২৭-১৯২৯ এর মধ্যে লক্ষ্ণৌতে জুডিশিয়্যাল কোর্টের মেয়াদশেষে তৈরি হল চীফ কোর্ট। প্রথম চীফ জাস্টিস্ একজন ইউরোপীয়ান। তা ছাড়া ছিলেন একাধিক ভারতীয় জজ্। এখানেও একাধিক ক্ষেত্রে স্বজনপোষণে স্বাধীনচেতা অতুলপ্রসাদ অপমানিত বোধ করে প্রতিবাদ করেন ও সরে দাঁড়ান।

১৯২৭ সালেই উত্তরায় রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রকাশের ব্যাপারে আপত্তি ওঠায় আবার অতুল আঘাত পান।

এই দুই ধাক্কা সামলে নিয়ে ১৯২৯ এ আমরা দেখছি অতুলপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্ণৌ আগমন নিয়ে মেতে উঠছেন। হেমন্ত নিবাসে তাঁর আতিথ্যের ব্যবস্থা হল, অথচ তিনি বিব্রত, তাঁর প্রাসাদ যে সঙ্গিনীহীন। সে বার ভাইয়ের স্ত্রী ললিতা দাস সে ভার নিয়ে তাঁকে উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তি দিলেন। সে সময় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অতুলের আমন্ত্রণে লক্ষ্ণৌ আসেন।

এ সময়ে অতুলের আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল, দুটি বাঙালি সংস্থা ‘বেঙ্গলী- ক্লাব’ ও ‘বঙ্গীয় যুবক সমিতি’র সংযোজন, --- যার নতুন নাম হল--- ‘বেঙ্গলী ক্লাব ও ইয়ংম্যানস্ অ্যাসোসিয়েশান’ যার প্রথম সভাপতি হলেন অতুলপ্রসাদ সেন।

হেমকুসুমেরও একার জীবন। ছবি আঁকা, গান, সেলাই ইত্যাদিতে সময় কাটান। গাড়িতে চড়ে যেটুকু বেড়ান, সে সময় হরিমতী গার্লস স্কুলের অধ্যাপিকাদের সাথে আলাপ করেন। (এই হরিমতী গার্লস স্কুলই পরবর্তীতে A.P. Sen Memorial Girl’s College নামে অভিহিত হয়।) এ রকম একদিন স্নেহ চৌধুরীর কাছে এসে ফরমাশ করেন, ‘গান কর তো শুনি, এ.পি.সেনের গান’! গান শোনার শেষে বলেন, ‘গান এ.পি. সেন ভালই লেখে, তবে বড় কুইপারা সুর (করুণ সুর)!’

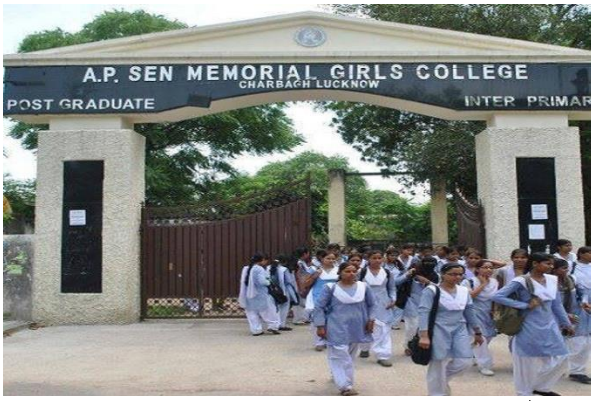

এ.পি. সেন মেমোরিয়াল গার্লস কলেজ। সৌজন্যে কলেজ ওয়েবসাইট।

আবার অশান্তি ঘনায় দাম্পত্যে। এতদিন মাঝেসাঝে হলেও যেটুকু দেখা-সাক্ষাত ঘটত, তাও বন্ধ হল। অনেক আত্মীয় মিটমাট করার চেষ্টা করেছেন, সুবিধাবাদী কিছু মানুষ আবার এতে ইন্ধনও যুগিয়েছেন। এ অবস্থায় তাঁরা স্থায়ীভাবে আলাদা থাকার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত এক আত্মীয়ের মধ্যস্থতায় শান্তি ফেরে। তবে এই চরম অশান্তির সময় অতুল তাঁর উইলটি রচনা করেন। মানসী মুখোপাধ্যায়ের লেখনীতে এই তথ্য পেলেও শোভন সোম লিখেছেন, ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে অতুলপ্রসাদ ১৯৩০ এর ৩রা মে তাঁর উইলটি করেন।

১৯৩০ এ চতুর্থবারের জন্য অতুলপ্রসাদ বিলেত যাচ্ছেন --- গেওারা তালুকের কেস নিয়ে সেই প্রিভি কাউন্সিলে। ইতিমধ্যে তাঁর শরীর ভেঙেছে নানা উপসর্গে। কর্তব্যের তাগিদ ছিল তো বটেই, বন্ধুদের পরামর্শও মনে ধরল, যে হাওয়া বদলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হতেও পারে! কিন্তু দেশের পরিস্থিতিতে মনে উদ্বেগ --- গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারা ভারত জুড়ে অসহযোগ আন্দোলনে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে, এ অবস্থায় তাঁকে দেশ ছেড়ে যেতে হচ্ছে।

বিলেতে গিয়ে তিনি লোকেন পালিতের স্ত্রীর অতিথি হলেন। রবীন্দ্রনাথ ও একই সময়ে সেখানে উপস্থিত। অতুলের তো আনন্দের সীমা নেই। আর্যভবনে গিয়ে কবির সাথে দেখা করলেন,--- সেখানে আলাপ হল চার চিত্রশিল্পীর সাথে ; ---ললিতমোহন সেন, সুধাংশু রায়চৌধুরী, রণদা উকিল এবং ধীরেন দেববর্মা। যথারীতি গানের আসরও বসে গেল। পরে সে সময় আলাপ হয়েছিল রণজিৎ সেনের সঙ্গে। তাঁর প্রশ্নে অতুল জানিয়েছিলেন, গান বাঁধবার জন্য তাঁর কখনও বিশেষ পরিবেশের প্রয়োজন পড়ত না। Recess এর সময়ে কোর্ট ভর্তি উকিল, পেয়াদা, আরদালী, সান্ত্রীর মাঝেও যেমন লিখেছেন,--- 'ওগো আমার নবীন শাখী, ছিলে তুমি কোন বিমানে', তেমনই বাথরুমে মাথায় জল ঢালতে ঢালতে লিখেছেন, 'জল বলে, চল মোর সাথে চল'!

গানের স্বরলিপি সম্বন্ধে তাঁকে বলেছেন, সে হল সুর আর তালের কাঠামো, তবে তাতেই যে গানকে বেঁধে রাখতে হবে তা নয়। সমবেত সংগীতে সেটা প্রয়োজন। কিন্তু, একক গানের ক্ষেত্রে --- ঠুংরী, গজল, খেয়াল ইত্যাদির সময়ে শিল্পী যদি ভাব বজায় রেখে তান বিস্তার করেন, তবে তা দূষনীয় নয়। স্বাধীনতাও যেমন থাকবে, যথেচ্ছাচারও চলবে না। তাই নিজের গান যাতে ভবিষ্যতে বিকৃত না হয়, বলছেন, "ভাবছি হিমাংশু (হিমাংশু দত্ত) কে দিয়ে স্বরলিপি করিয়ে রাখব।" পরে অবশ্য সাহানা দেবী তাঁর গানের স্বরলিপি করেন, সেগুলি 'কাকলি' বইটিতে প্রকাশিত হয়!

বিলেত থেকে অতুলপ্রসাদ কিছুটা সুস্থ হয়ে দেশে ফিরলেন। এসেই ছোট ভগ্নীপতির মৃত্যুসংবাদে আবার আঘাত পেলেন।

১৯৩১ । অতুলের শরীরের অসুস্থতা আবারও বাড়তে লাগল। কারও কথা শোনেন না। নানা জায়গায় ছুটে বেড়ান, যদিও তা সবই মহৎ উদ্দেশ্যে! ডাক্তারের অনুরোধে কাজ কমিয়েছেন, তবু শরীর মানে না। বোন কিরণ কলকাতায় নিজের কাছে নিয়ে এলেন দাদাকে। ডাঃ নীলরতন সরকার তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রামের নির্দেশ দিলেন। গানও বন্ধ। কিন্তু বিধি বাম। অমল হোমের কাছে খবর পেলেন, ১৩ই মে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন হবে। সবার নিষেধ অমান্য করে সে সভায় শুধু যোগই দিলেন না, ভাষণ দিলেন এবং গাইলেন,

'গাহো রবীন্দ্রজয়ন্তী-বন্দন'.... ।

শুধু তাই-ই নয়, এলাহাবাদ ও দিল্লীতে মহা সমারোহে কবির ৭০তম জন্মজয়ন্তী পালন হল, তাতেও তিনি যোগদান করলেন। এলাহাবাদে গান করলেন,---

'জয়তু জয়তু জয়তু কবি'।

সভাপতি হিসাবে সুদীর্ঘ ভাষণ পাঠ করলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যে জীবনব্যাপী হার্দিক যোগাযোগ---প্রায় সবটুকুই ধরা রইল সে ভাষণে! আমরা আজ ঋদ্ধ হই সে সব পাঠে।

১৯৩১ এ গরমের ছুটির পর তিনি লক্ষ্ণৌতে ফিরে এলেন। এবারে গৌরবোজ্জ্বল একটি বিশেষ ঘটনা --- লক্ষ্ণৌএর প্রথম ভারতীয় হিসাবে আউধ বার কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন অতুলপ্রসাদ। এর আগে কেবলমাত্র রাজপুরুষেরাই এই পদে আসীন ছিলেন।

এবারে আবার চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসা। সে সময়ে 'কয়েকটি গান' এ আরও কিছু গান সংযোজিত করে 'গীতিগুঞ্জ' নামে প্রকাশ করান। প্রথম সংস্করণের প্রকাশে অতুলপ্রসাদ লেখেন, ---" 'কয়েকটি গান' প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল। তারপরেও কতকগুলি গান রচিত হয়েছে, সব একসঙ্গে 'গীতিগুঞ্জে' ছাপান হইল।

আমার যে গানগুলির স্বরলিপি 'কাকলি' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে, 'গীতিগুঞ্জে' তার নির্দেশ রহিল।

স্নেহাস্পদ শ্রীমান হরিহর চন্দ্রের সহায়তায় 'গীতিগুঞ্জ' প্রকাশিত হইল, তজ্জন্য আমি তাহার নিকট ঋণী।
২৪শে অক্টোবর, ১৯৩১, শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন।"

'গীতিগুঞ্জ' এর গানগুলিকে বিষয়ানুযায়ী পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।
'দেবতা' (৫৪টি গান) - 'আমারে ভেঙে ভেঙে করহে তোমার তরী'
'প্রকৃতি' (১৭) - 'মোরা নাচি ফুলে ফুলে দুলে দুলে'
'স্বদেশ' (১৪) - 'উঠগো ভারত লক্ষ্মী'
'মানব' (৫২) - 'কাঙাল বলিয়া করিও না হেলা'
'বিবিধ' (৫৭) - 'আপন কাজে অচল হলে'।
পরে 'পরিশিষ্ট'এ কিছু (৮) গান --- 'প্রবাসী চল রে দেশে চল' পাওয়া যায়।

১৯৩২ এ রবীন্দ্রনাথ নিজের কাব্যগ্রন্থ 'পরিশেষ' উৎসর্গ করেন অতুলপ্রসাদকে।

আশীর্বাদ

শ্রীমান অতুলপ্রসাদ সেন করকমলে---

বঙ্গের দিগন্ত ছেয়ে বাণীর বাদল
বহে যায় শত স্রোতে রসবন্যা বেগে ;
কভু বজ্রবহ্নি কভু স্নিগ্ধ অশ্রুজল
ধ্বনিছে সঙ্গীত ছন্দে তারি পুঞ্জমেঘে

......আজি পূর্ববায়ে
বঙ্গের অম্বর হতে দিকে দিগন্তরে
সহস্র বর্ষণধারা গিয়েছে ছড়ায়ে
প্রাণের আনন্দ বেগে পশ্চিমে উত্তরে ;
দিল বঙ্গ বীণাপাণি অতুলপ্রসাদ,
তব জাগরণী গানে নিত্য আশীর্বাদ।' (রবীন্দ্র রচনাবলী, ৮ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৮৮)

অতুলপ্রসাদ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

প্রসঙ্গতঃ,---কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালও তাঁর 'ত্র্যহস্পর্শ' গ্রন্থটি অতুলপ্রসাদকে উৎসর্গ করেছিলেন।

১৯৩৩। ধীরে ধীরে অতুলের শরীর আরও ভেঙে পড়তে লাগল। হৃতস্বাস্থ্য ফিরে পাওয়ার আশা প্রায় নেই। এ অবস্থায়ও অক্টোবরে এলাহাবাদে ও ডিসেম্বরে গোরক্ষপুরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতি হিসাবে যোগ দিলেন। অভিভাষণে এখানে তিনি বললেন, "আমার মতে সাহিত্যের উপকরণ প্রধানতঃ তিনটি---ভাব, ভাষা ও ভঙ্গী।" তাঁর জন্মভূমি বাংলা মায়ের কথা উঠে এল, --- যে নাড়ীর টান এই শেষবেলায় তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিচ্ছে,---

'প্রবাসী, চল্ রে দেশে চল্।
........মনে পড়ে দেশের মাঠে খেত-ভরা সব ধান,
মনে পড়ে তরুণ চাষির করুণ বাঁশির তান,....'

আবার লক্ষ্ণৌকে তিনি এত ভালবেসেছেন যে নিজেকে 'প্রবাসী' উল্লেখে ক্ষমাপ্রার্থনা করছেন। অতুলনীয় এই ব্যক্তিত্ব!

সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্মেলনের ডাক এলে তিনি সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে নিজেকে বিলিয়ে দিতেন। দীর্ঘ ভাষণের পর শরীর খুব ক্লান্ত, তবু কেদারনাথকে সঙ্গে নিয়ে দেখা করতে গেলেন চারুচন্দ্র দাসের বাড়ি। তিনি অতুলকে শ্রান্ত দেখে বললেন, না আসাই উচিৎ ছিল। অতুল বললেন, "উচিৎ তো অনেক কিছুই থাকে, কটা পারলুম।"

এ সময় এলাহাবাদে লিবের‍্যাল পার্টির উত্তরপ্রদেশ শাখার অষ্টম অধিবেশন, ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে সেখানেও যোগ দিলেন।

ইতিমধ্যে তাঁর স্বাস্থ্য আরও ভেঙেছে। সে কারণে এবারে কার্শিয়াং গেলেন। সেখানে দেখা হল নৃত্যশিল্পী উদয়শংকরের সঙ্গে। তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনায় প্রীত হলেন। কার্শিয়াংএ থেকে শারীরিক কিছু উন্নতি হওয়ায় আবার লক্ষ্ণৌ ফিরে এসে কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

এরপর একদিন হঠাৎ তাঁর বাঁদিক অবশ হয়ে গেল, তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। ডাক্তার ব্যাসের (Vyas) চিকিৎসায় সামান্য সুস্থ হতে ডাক্তার তাঁকে সমুদ্রের ধারে বিশ্রাম নিতে পরামর্শ দিলেন। মাঝে কিরণের কাছে কলকাতায় থেকে ডাঃ নীলরতন সরকারের চিকিৎসা নিলেন। আবার লক্ষ্ণৌ। স্বাস্থ্যের ক্রমশঃ অবনতিই হতে লাগল। সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে এবার বাধ্য হলেন। শেষ পর্যন্ত পুরী যাওয়াই ঠিক হল। খবর শুনে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তাঁর সাথে দেখা করতে এলেন ও নিজেদের পরমাত্মার কাছে তাঁর জন্য প্রার্থনা জানালেন। কিন্তু দাতাকর্ণের হাতে নিজের শরীরের জন্য টাকা কোথায়? ব্যাঙ্ক থেকে ওভারড্রাফট নিলেন আট হাজার টাকা। তাও শেষ মুহূর্তে ড্রাইভার জয়চাঁদের আবেদনে প্রয়োজন বুঝে তার থেকেই পাঁচশো টাকা তাকে দিয়ে দিলেন। ১৯৩৪ এর ১৫ই এপ্রিল পুরীর জন্য রওনা হলেন সঙ্গে গেলেন পুত্র দিলীপ, বোন প্রভা ও তার কন্যা কুন্তলা।

পুরীতে একটি বাড়ি নিলেন। সকালে সবার সঙ্গে সূর্যোদয় উপভোগ করে, সমুদ্রস্নান করে ও বিকেলে সাগরবেলায় মানুষের উচ্ছ্বাস দেখে তাঁর শরীর এবার অনেক আরাম পেল। কিন্তু অতুল যেখানে, নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ সেখানে কোথায়! খবর পেলেন, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পুরীতে এসেছেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথও এ খবর পেলেন, সস্ত্রীক দেখা করতে এলেন তাঁর সাথে। রাধাকুমুদের সঙ্গেও পুরীতেই দেখা হল। তিনি অতুলের স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখে আশ্বস্ত হলেন।

এবারে অনেকে জেনেছেন, অতুলপ্রসাদ পুরীতে আছেন। শুরুতে কেবল আলাপ, পরে গানের অনুরোধ ও শেষে আসর-বৈঠকের থেকেও ডাক আসতে লাগল তাঁর কাছে। প্রভা ও কিরণ শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। এই জন্যই বোধ করি অমল হোম তাঁকে বলেছেন "অক্লান্ত কণ্ঠ এক সঙ্গীত-সন্ন্যাসী"।

ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধীও পুরী এলেন। অতুলের কাছে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার মানুষ। তাঁর অনুরোধে অতুল গান্ধীজীর প্রিয় গান 'কে আবার বাজায় বাঁশি'র হিন্দী অনুবাদ করে শোনান। গান্ধীজী মুগ্ধ হলেন ও তাঁর গানের অজস্র প্রশংসা করলেন।

মাস দেড়েক কাটিয়ে অতুলপ্রসাদ লক্ষ্ণৌ ফিরলেন। হেমন্তনিবাস আবার মুখরিত হল। সুরেশ উত্তরা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য কাশী থেকে অতুলের কাছে এলেন। কিন্তু তাঁর শরীর দেখে খুব উৎফুল্ল হতে পারলেন না। 'আর কিছুদিন থেকে এলেন না কেন'---জানতে চাইলে অতুল বললেন, 'আমার

কি আর বসে থাকলে চলে সুরেশ! কত লোক আমার ওপর নির্ভর করে বসে আছে, চারিদিকে কত-ও প্রয়োজন।....টাকার আমার এখন বড় দরকার সুরেশ, আমায় এখন অনেকদিন বাঁচতে হবে, অনেক টাকা উপায় করতে হবে!'

২৫শে আগস্ট, অতুল প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে কী মনে হওয়ায় এ.পি.সেন রোডে পরিচিত সবার সাথে দেখা করলেন। হেমন্ত কুমার থেকে শুরু করে রাধাকৃষ্ণ শ্রীবাস্তব পর্যন্ত দেখা করলেন। কিছু পরে তাঁর জুনিয়রের সঙ্গে পরের সোমবারের কেস নিয়ে আলোচনা করলেন। তারপর একজনের চিঠির উত্তরে লিখলেন, 'আমি যাবার আগে কাউকে যেন কষ্ট না দিই ও নিজে না কষ্ট পাই--এই কামনা করি।' সেদিন সন্ধ্যায় একটি ডিনার পার্টিতে তাঁর পৌরহিত্যের কথা ছিল। এ সব ছোট জায়গায় তিনি লিখে বক্তৃতা করতেন না, অথচ সেদিন সে বক্তৃতার বয়ান লেখা শুরু করেন, যদিও তা শেষ করেন নি। টেবিলে কেউ অটোগ্রাফের খাতা রেখে গেছে,--- সেখানে লিখলেন,

"যে জন রহিতে চায় নিজ রুদ্ধ ঘরে
হারানিধি নিরবধি সেই খুঁজে মরে।"

স্নান শেষে পিতা-পুত্রে কিছু আলোচনা করতে করতে খেতে বসলেন। কয়েক চামচ খাবার পর অতুলপ্রসাদের হাত থেকে হঠাৎ চামচ মাটিতে পড়ে গেল। তিনি চেয়ারের উপর লুটিয়ে পড়লেন। হেমন্তকুমার সেদিন বাড়িতেই ছিলেন। দিলীপকুমার ছুটে গিয়ে তাঁকে ডেকে আনলেন। দুজনে ধরাধরি করে অর্ধ-অচৈতন্য অতুলপ্রসাদকে পালঙ্কে এনে শুইয়ে দিলেন। পাশের ডাক্তার সেনকে খবর দিয়ে আনান হল। বেলা দুটো-আড়াইটা নাগাদ ডঃ ব্যাস এলেন, নার্সকেও আনা হল। ঝোলানো হল 'ভিসিটর্স নট অ্যালাউড' বোর্ড। হিরণ বিলেতে, কিরণ নৈনীতালে ও প্রভা কলকাতায়। তাঁদের সবাইকে খবর পাঠানো হল।

'সেন-সাহেব' অসুস্থ, এ খবর লক্ষ্ণৌতে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সব সম্প্রদায়ের, সব স্তরের 'জনস্রোত জলস্রোতের মত হেমন্তনিবাসের দিকে ছুটল।' স্তম্ভিত, উৎকণ্ঠিত জনতা একবার তাঁদের প্রিয় মানুষটিকে দেখতে চান। অবস্থার কোনও উন্নতি না হওয়ায় রাত আটটায় ডাক্তার হাণ্টারকে ডেকে আনা হল। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

অতুলের খবর হেমকুসুম দেরিতে হলেও পেয়েছিলেন, তিনি উৎকণ্ঠিত হলেও ব্যস্ত হন নি। চিকিৎসা চলছে, ডাক্তারেরা আসছেন জেনে ভেবেছিলেন এবারও সেরে উঠবেন। অসুস্থ মানুষ শুয়ে পড়েছিলেন।

মানসী মুখোপাধ্যায় লিখছেন, ----"ইংরেজী মতে ২৬ শে আগস্ট রাত একটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে গ্রহ তার কক্ষচ্যুত হল, লখনৌ শহরের বুকে অশনিপাত ঘটে গেল, একটি বিরাট এবং মহৎ প্রাণ এ মরজগৎ থেকে বিদায় নিয়ে সুরলোকে মহাপ্রয়াণ করলেন।
.......লখনৌয়ের মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে গোমতী নদীর ধারা ; তার দুই তীরকে দানে ধন্য করে, সবুজ করে সমৃদ্ধ করে আপন লক্ষ্যে ছুটে চলেছে।

শহরের মাঝ দিয়ে আজ আরো একটি ধারা বয়ে চলেছে---জনতার ধারা ; জনতা তাঁদের নেতা, বন্ধু, পরমপ্রিয় সেন সাহেবকে শেষ বিদায় দিতে চলেছেন---যিনি তাঁর মনের ঐশ্বর্য, সুষমা ও ভালবাসা দিয়ে লখনৌকে সুন্দর, সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। শুধু কি লখনৌ, সারা উত্তর প্রদেশ তাঁর স্নেহধন্য, সারা ভারত তাঁর পরমপ্রিয়।'

আগের রাতে প্রায় দুটোর সময়ে খবর পেয়ে ছুটে এসেছিলেন হেমকুসুম। গাড়ি থামতে হেমন্ত কুমার এসে বুঝিয়ে বললেন, 'সব তো শেষ, অসুস্থ শরীরে এখন না নেমে সকালে আসুন'। ফিরে চললেন আবার। রাতের অন্ধকারে তাঁর একাকীত্বের বেদনা বয়ে কপোল ভিজিয়ে দিতে লাগল অভিমানী অশ্রুধারা।

পরদিন সকালে মালাচন্দন শোভিত এ.পি.সেনের মরদেহ হেমন্ত নিবাসের লনে রাখা হল। সকাল হতেই লক্ষ্নৌ জানল ইন্দ্রপতনের খবর। কাগজের হেড লাইনে কেবল অতুল-প্রয়াণের কথা। সারা লক্ষ্নৌ ভেঙে পড়ল তাঁকে শেষ দেখা দেখতে। আবার এলেন হেমকুসুম। শান্ত সে মুখখানির দিকে চেয়ে রইলেন, দু চোখ বেয়ে বিন্দু বিন্দু জল নেমে এল, তারপরেই জ্ঞান হারিয়ে গাড়ির মধ্যে লুটিয়ে পড়লেন।

শেষ শয্যায় অতুলপ্রসাদ। মানসী মুখোপাধ্যায়ের "অতুলপ্রসাদ" গন্থের ছবি।

ওদিকে সবার প্রিয় অতুলপ্রসাদের মরদেহ কাঁধে তুলে নিয়েছেন মহম্মদ নাসীম, জগৎনারায়ণ মোল্লা, মিস্টার টমাস, বিশ্বেশ্বর শ্রীবাস্তব ও আরো সকলে। সে এক দৃশ্য,--এমন সম্প্রীতির ছবি আজকের ভারতে বিরল। নগ্ন পায়ে শোকমিছিলে পা মিলিয়েছেন চীফ কোর্ট, জাজেস কোর্টের নামজাদা জজ, ব্যারিস্টার, উকিল, কর্মচারী সবাই। অতুলপ্রসাদের লক্ষ্নৌবাসীদের প্রতি সমস্ত ভালবাসা, সব রকমের দান সেদিন যেন সম্মাননা হয়ে তাঁর কাছেই ফিরে এল! সারা লক্ষ্নৌ শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে প্রণতি জানালেন। যাঁর কাছে বারে বারে শান্তির আশ্রয় পেতে চেয়েছেন, চিতার বহ্নিশিখায় যেন অতুলপ্রসাদ সেই পরমপুরুষের সাথে মিলিত হলেন,---সব দুঃখ, সব আঘাতের ঊর্দ্ধে! যথাসময়ে সুচারুভাবে ব্রাহ্মমতে তাঁর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, আচার্য ছিলেন পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন।

শুনতে বিস্ময় জাগলেও, কাওরাইদ ইউনিয়নএর তথ্য অনুযায়ী ঢাকার গাজীপুর জেলার শ্রীপুরের অনতিদূরে কাওরাইদে (কাওরাদি) সুতিয়া নদীর কাছে অতুলপ্রসাদের সমাধির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। কাওরাইদে কালীনারায়ণ গুপ্ত ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মন্দিরের লাগোয়া জমিতে কালীনারায়ণ গুপ্ত, স্যর কে.জি.গুপ্ত ও পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গেই সমাধি রয়েছে অতুলপ্রসাদের। ওখানকার একমাত্র সর্বশেষ ব্রাহ্ম পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য শান্তা পাল ও তাঁর বড়

ভাই দীপক পাল (যিনি কাওরাইদ ব্রাহ্মমণ্ডলীর সাধারণ সম্পাদক) এর কথানুযায়ী, রবীন্দ্রনাথ এখানে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁরা সন-তারিখ জানাতে পারেন নি।

গাজীপুরের ইতিহাস-গবেষক ফরিদ আহমদ বলেছেন--এ রকম একটি জনশ্রুতি আছে ঠিকই, তবে প্রামাণ্য তথ্য কিছু নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ১৯২৬ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী ময়মনসিংহ যাবার পথে দিন সাতেক ঢাকায় থেকেছিলেন,--- এটি সত্য। তিনি আরও বলেন, ‘সমাধিতে কারোরই মরদেহ নেই, চিতাভস্ম রয়েছে। কেউ লক্ষ্মৌ, কেউ লণ্ডন, কেউ কলকাতা, ---যে যেখানে মারা গেছেন, সেখানেই তাঁর দাহ হয়, পরে সেই সব চিতাভস্ম এনে কাওরাইদে সমাধি তৈরি হয়।’ এই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম জানান, এই সমাধি ফলকে ‘মোদের গরব, মোদের আশা’র এই চরণটি খোদিত ছিল, যা মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মন্দির এবং এই সমাধিস্থল এখন প্রায় অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে।

বাংলাদেশের গাজীপুর জেলার শ্রীপুরের কাছে কাওরাইদে, সুতিয়া নদীর কাছে অতুলপ্রসাদের সমাধি।
সৌজন্যে কাওরাইদ ইউনিয়ন ওয়েবসাইট, বাংলাদেশ। এই ফলকে লেখা আছে ---

শেষে, ফির্ ব যখন সন্ধ্যাবেলা, সাঙ্গ করে ভবের খেলা,
জননী হয়ে আমায় কোল বাড়ায়ে ল’বে।

আমার যে শুন্য ডালা, তুমি ভরিও !
আর, তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও।

বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি অতুলপ্রসাদের প্রয়াণে তাঁর পুত্র দিলীপ কুমারকে তাঁদের শোকবার্তা পাঠান।
রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,---

"কল্যাণবরেষু,
তোমার পিতাকে আমি পরমাত্মীয় বলেই জেনেছি। অকস্মাৎ তিনি চলে গিয়ে আমার অন্তরঙ্গ প্রিয় বন্ধুশ্রেণীতে যে শূন্যতা ঘটল সে আমার কাছে গভীর বেদনার কারণ।
ভগবান তোমাদের সকলকে শান্তি ও সান্ত্বনা দিন এই আমার কামনা।"

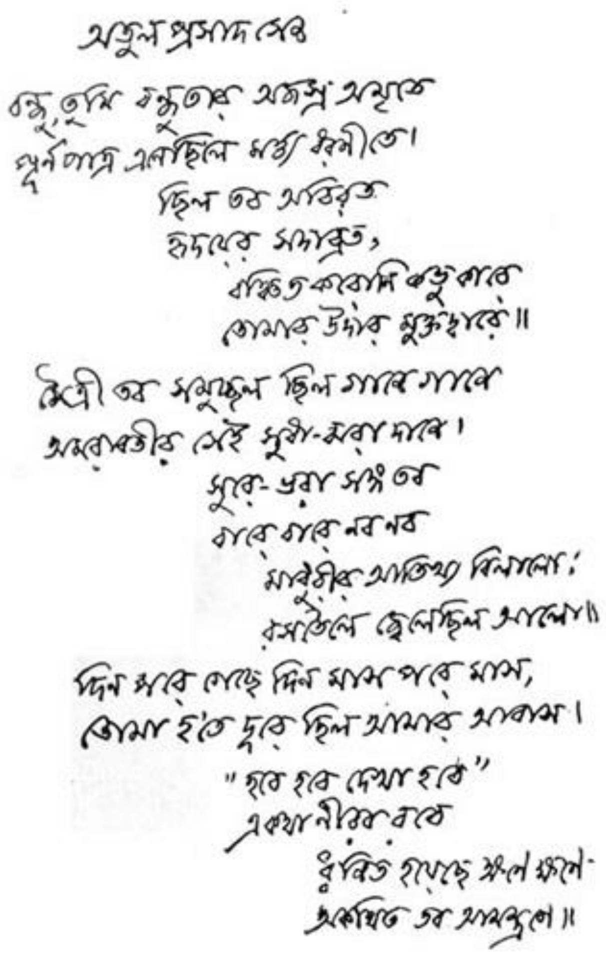
অতুলপ্রসাদ সেন

বন্ধু, তুমি বন্ধুতার অজস্র অমৃতে
পূর্ণপাত্র এনেছিলে মর্ত্য ধরণীতে।
ছিলে তব অবিরত
হৃদয়ের সদাব্রত,
বঞ্চিত করোনি কভু কারে
তোমার উদার মুক্তদ্বারে॥

মৈত্রী তব সমুজ্জ্বল ছিল গানে গানে
অমরাবতীর সেই সুধা-ঝরা দানে।
সুরে-ভরা সঙ্গ তব
বারে বারে নব নব
মাধুরীর আতিথ্য বিলালো;
রসতৈলে জ্বেলেছিলে আলো॥

দিন পরে গেছে দিন মাস পরে মাস,
তোমা হ'তে দূরে ছিল আমার প্রবাস।
"হবে হবে দেখা হবে"
এ কথা নীরব রবে
ধ্বনিত হয়েছে ক্ষণে ক্ষণে
অকথিত তব আমন্ত্রণে॥

রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখায় 'বন্ধু তুমি বন্ধুতার অজস্র অমৃতে'। সৌজন্যে উইকিমেডিয়া।

নিঃসঙ্গ হেমকুসুমের কাছে তাঁর অনেক বন্ধু, গুণমুগ্ধ ভক্তরা যেতেন, সান্ত্বনা দিতেন। তার মধ্যে সুধীন্দ্র চন্দ্র দাস, হেমন্ত কুমার, তাঁদের স্ত্রীরা, ইন্দিরা রায়, জুবিলী কলেজের অধ্যাপিকারা, অনুগত অরুণ প্রকাশ, কমলাকান্ত, বেগম মমতাজ হোসেন, বেগম মুবাশীর হোসেন ইত্যাদিরা ছিলেন। ধীরে ধীরে কিছুদিন পর হেমকুসুম শান্ত হলেন ঠিকই, তবে অতুলপ্রসাদের শেষ উইল তাঁকে বড় আঘাত করেছিল! উপার্জিত অর্থের বেশিটাই অতুলপ্রসাদের জীবিতাবস্থায় লোকসেবায় ব্যয়িত হয়েছিল; অবশিষ্ট সম্পত্তির অধিকাংশ, তাঁর বাড়িটি এবং গ্রন্থসত্বও তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দান করে গিয়েছিলেন। হেমকুসুম ও পুত্র দিলীপ কুমারের ভবিষ্যতের জন্য কিছু অর্থ মাসোহারা হিসেবে রেখে গেছিলেন। এরপর পুত্রের বাসস্থানের জন্য হেমকুসুমকে স্যর কে.জি. গুপ্তর কাছ থেকে পাওয়া অর্থে হাত দিতে হয়! হেমকুসুম ভগ্নহৃদয় নিয়ে আর খুব বেশিদিন কষ্ট পান নি, ---১৯৩৭ এ চুল আঁচড়াতে গিয়ে চিরুণীর আঘাতে মাথায় চোট পান। পরে তা গ্যাংগ্রীনে পরিণত হয় এবং ডাঃ ভাটিয়ার চিকিৎসা বিফল করে তিনি প্রখর গ্রীষ্মের ২রা জুন মৃত্যুর শীতল কোলে ঢলে পরেন।

অপার্থিব জগতে পরম করুণাময়ের বসন্তবনে বুঝি এবার এই দুই বিরহীর প্রেম অনন্ত মাধুরীর রূপ নিল! ...

.... 'এলে কি দু কূল হ'তে কূল মেলাতে এ অকূলে?'

অতুলপ্রসাদ সেন --- যিনি ব্যবহারজীবী মহলে যেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, সর্বভারতীয় রাজনীতিতেও যাঁর স্বচ্ছন্দ সম্মানীয় বিচরণ, দেশপ্রেমের অকপট সাক্ষর যাঁর দেশাত্মবোধক গানে. সমাজসেবী হিসাবে যিনি সুপরিচিত, বদান্যতা ও উদারতা যাঁর সহজাত, বঙ্গ সাহিত্যের যিনি কাণ্ডারী, নিরলস কর্মী ও সবার উপরে যিনি কবি এবং ব্যঞ্জনাময় সুমধুর গীতিকাব্যের সার্থক রচয়িতা, ---তাঁকে কোন আলেখ্য দিয়ে বাঁধা বড় সহজ কর্ম নয়। তাঁর জীবনটি শতধারায় প্রবাহিত, কোনও গণ্ডীর মধ্যে ধরা বড়ই কঠিন। তাই এর অসম্পূর্ণতা যা রইল, তার জন্য পাঠকের কাছে আবেদন . . . 'ক্ষমো হে মম দীনতা'!

অতুলপ্রসাদের জন্ম শতবর্ষে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধার সাথে যে স্মৃতিচারণ করেছেন তারই কিছু টুকরো ছবি তুলে ধরলে মানুষ অতুলপ্রসাদ তথা তাঁর সাঙ্গীতিক জীবনকে চেনা কিছুটা হয়তো সহজ হবে।

দিলীপ কুমার রায় বলেছেন, --- "ইংরেজী ভাষায় Composer বা ফরাসী ভাষায় Compositeur কথাটির সদর্থ হচ্ছে নূতন সুর বা সুরসমষ্টির স্রষ্টা। তাই অতুলপ্রসাদকে শুধু Composer বললে তার যথার্থ সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হবে না। সুতরাং তাঁর প্রতি যথেষ্ট সুবিচারও করা হবে না। কেন না তিনি সুর-রচয়িতা মাত্র নন --- সঙ্গে সঙ্গে একজন মনোজ্ঞ কবি। তাই এক-কথায় তাঁকে গীতিকবি আখ্যা দেওয়াই বোধ হয় বেশি সংগত। কারণ তাঁর গানে কবিত্ব ও সংগীতের বড় সুন্দর সম্মিলন সংসাধিত হয়েছে বলে আমার মনে হয়।"

দিলীপ কুমারের মতে অতুলপ্রসাদের গানগুলিকে মূলতঃ দুভাগে ভাগ করা যায়। এক তো, খাঁটি কীর্তন ও বাউলের সরল হৃদয়স্পর্শী সুরের সাথে তাঁর কবিত্বের আধুনিকতাকে স্বাভাবিকভাবে মেশানো হয়েছে, এখানেই অতুলপ্রসাদের সুন্দর মৌলিকতা। অপর, তাঁর কৃতিত্ব যে, এসব গানে হিন্দুস্থানী ঢঙকেও মেশাতে কৃতকার্য হয়েছেন। যেমন--- কীর্তন-বাউলের সঙ্গে হিন্দস্থানী পিলুর রস দিয়ে 'ওগো আমার নবীন শাখী, ছিলে তুমি কোন বিমানে' তৈরি হয়েছে।

তাঁর কৃতিত্বে ভক্তিরসের বৈরাগ্যর সাথে কবিত্ব মিশিয়ে অভিনব রূপ মূর্ত হয়ে উঠে হৃদয়তন্ত্রীকে আঘাত করে।.... 'হরি হে, তুমি আমার সকল হবে কবে'। আবার বলছেন, মানব-মনে চিরন্তন যে অসীমকে পাওয়ার আকাঙ্খা থাকে, ---তাকে প্রকাশ করার ক্ষমতা সবার থাকে না। অতুলপ্রসাদ সেখানে সার্থক। গীতিকবি অতুলপ্রসাদের শিল্পের দিকে শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি বোধহয় তাঁর হিন্দুস্থানী সঙ্গীত---বিশেষতঃ টপ্পা-ঠুংরির তালের গানের প্রতি অনুরাগ। তিনি এ গানের একজন বিশেষজ্ঞ ও পরমভক্ত ছিলেন। .... 'বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখিপাতে' ---এই বেহাগ গানটিতে যে রস পাই তা এত করুণ-মধুর কারণ, ---বাংলার কবিত্ব ও বৈষ্ণব কবির চিরন্তন ও চিরতম বিরহ গানের সুরের সঙ্গে খাঁটি হিন্দুস্থানী বেহাগের এক অপরূপ মিলন সাধন করা হয়েছে।

আবার এক জায়গায় বলছেন,
".... 'বাদল ঝুম ঝুম বোলে' --- এ গানটি ঠুংরি-খাম্বাজে রচিত। বস্তুত আমি হিন্দুস্থানী সংগীতের বিকাশধারাকে শুধু হিন্দুর কীর্তি বলে মনে করি নে, এ জন্য আমরা মুসলমান সভ্যতার কাছে গভীরভাবে ঋণী। .....সুতরাং আমি অতুলপ্রসাদের গানকে আরও অভিনন্দিত করি ও সেটা এই ভেবে যে, এই গীতিকবির রচনার মধ্য দিয়ে বাঙালী এ রসের সম্পূর্ণ না হলেও অনেকটা পরিচয় পাবে ও আদর করতে শিখবে।"

রাজ্যেশ্বর মিত্রর ভাষায় --- "অতুলপ্রসাদের সমগ্র রচনা পরিক্রমা করে উপলব্ধি করা যায় যে তিনি এমন একটি স্তরে এসেছিলেন যেখানে শিল্পী একটি সার্থক চৈতন্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। তখন একটা বোধ মনকে জাগ্রত করে যার ইঙ্গিতে শিল্পীর সমগ্র সৃষ্টি সৌন্দর্যে, মাধুর্যে, গভীরতায়, মানবিকতায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। খুব কম সঙ্গীতশিল্পীই এই স্তরে উন্নীত হতে পারেন। আমাদের সঙ্গীতজগতে যে স্বল্প কয়েকজন এই দিব্য অনুভূতির স্পর্শলাভ করে পুণ্যশ্লোক বলে পরিগণিত হয়েছিলেন, অতুলপ্রসাদ তাঁদেরই একজন।"

অতএব আমরা দেখি, প্রচলিত লৌকিক রীতির ধারাকে অতুলপ্রসাদ উত্তর ভারতীয় রাগসঙ্গীতের স্পর্শমাধুর্যে একটি বিশেষ আঙ্গিক দান করেছিলেন যার ফলে বাংলা সঙ্গীত সম্ভার অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। যেমন, লাউনীতে--- 'কেন এলে মোর ঘরে', সাওয়ানীতে--- 'ঝরিছে ঝর ঝর', পিলু-বারোয়াঁয়--- 'কে আবার বাজায় বাঁশি', কাজরী ঢঙে--- 'জল বলে চল, মোর সাথে চল' প্রভৃতি। আবার, 'মোরা নাচি ফুলে ফুলে'--- এটিকে নটমল্লার বললেও, এখানে প্রধানতঃ খাম্বাজেরই চলন দেখা যায়। 'খাম্বাজ' ছিল এই গীতিকবির জনপ্রিয় রাগ। মিশ্রখাম্বাজ, গুজরাটী, সিন্ধু, বেহাগ, ঝিঁঝিট, পিলু--- সব ধরণের খাম্বাজেই নিবদ্ধ তাঁর সৃষ্টি। এর পরেই তাঁর পছন্দের রাগ 'ভৈরবী'।--- 'শুন, সে ডাকে আমারে' এই রাগে বিখ্যাত গান। তাঁর 'ভৈরবী' বড় করুণ-মধুর! কিছু স্বল্প-প্রচলিত রাগেও তাঁর গান আছে, যেমন---মেঘ, পঞ্চম, নট-নারায়ণ, নায়কী, কানাড়া, কর্ণাটী, খট্ ইত্যাদি ; 'তব পারে যাব কেমনে' (নায়কী কানাড়া)। তাঁর গজল ছিল ভারি মরমী।--- 'কত গান তো হল গাওয়া', 'ভাঙা দেউলে মোর কে আইলে' অথবা 'ওগো ক্রন্দসী পথচারিণী'! কীর্তনাঙ্গে--- 'আমার চোখ বেঁধে ভবের খেলায়', 'ওগো সাথী মম সাথী', 'কতকাল রবে যশ-বিভব অন্বেষণে' বা 'যদি তোর হৃদযমুনা'। বাউল সুরে--- 'মন রে আমার শুধু তুই বেয়ে যা দাঁড়', 'আর কতকাল থাকব বসে', 'মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন দেশে', 'প্রকৃতির ঘোমটাখানি খোল' বা 'মোদের গরব, মোদের আশা' ---গানগুলি। অতুলপ্রসাদের ধ্রুপদাঙ্গের গান খুব কম। --- ইমনকল্যাণে 'নমো বাণী বীণাপাণি' একটি খাঁটি ধ্রুপদ। আর --- 'ক্ষমিও হে শিব' গানটিও ধ্রুপদ আঙ্গিকের।

মামাতো বোন সাহানা দেবীর কথায়, --- "মৃদু মধুর সুরের নানা কাজের আলো- ছায়ার ভিতর ছোট্ট এক-একটি খোঁচ ও এক-একটি মোচড়ের ভিতর তাঁর সঙ্গীতে ধরা পড়ে সূক্ষ্মতার স্পর্শ, রস, কমনীয়তা ও লালিত্য। সব জড়িয়ে তাঁর গান হয়ে ওঠে একটা 'ডেলিকেসি'।"

ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন, "তাঁর গান গাওয়ার মধ্যে একটি কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে। সেটি হল, অবসর। আরম্ভ করার পূর্বেই গানকে অবসর দিতেন, চোখ বুজে, নীরবে জমি তৈরি করতেন, কালো ভেলভেটের ওপর কামদানীর কাজ ; আগ্রহে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করতাম। গান গাইবার সময়ে প্রত্যেক কথাকে অবসর দিতেন, বাক্যের সঙ্গে তার সম্বন্ধটি উপলব্ধি করার জন্য উদগ্রীব হতাম। নীরবতার আশ্রয়ে গানটি মিলিয়ে যেত, যেন মায়ের কোলে ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে--- আমরা নীরব হয়ে রস উপলব্ধি করতাম। তাঁর গান গাওয়া ছিল নিভৃতির কম্প্র রূপচ্ছটা, বাক্ হত সম্ভ্রমের সংযত কুশলতা। এই বিরাম কি তাঁর বিশ্রামবিহীন জীবনেরই ক্ষতিপূরণ? কে তাঁর জীবনের মর্মকথা বুঝে গান গাইবে! করুণায় মৃদুল, অন্তরেরই ভাব-সম্পদে অন্তর্মুখী যে নয়, সে যেন তাঁর গান না গায়।"

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের লেখনীতে দেখি,--- "তাঁহার গানে ও ছন্দে আছে আরব মরুভূমির তৃষ্ণার জ্বালা, অপরদিকে আছে একটা কঠোর বৈরাগ্য। একদিকে আছে ওয়েসিসের ভোগের চঞ্চল-চরণ-ভঙ্গ, অপরদিকে মায়া-মরীচিকার পরপারে চিরশান্তি। প্রকৃতি ও জীবন তাঁহাকে যত দান করিয়াছিল

তাহাদের সম্পদ, তাহা অপেক্ষা বঞ্চিত করিয়াছিল অধিক--- মরুজীবনের বিফলতা আনিয়া দিয়া, তৃষ্ণার জলের পরিবর্তে গরলের পেয়ালা বারবার তাঁহার শুষ্ক ওষ্ঠপুটে ধরিয়া।

‘প্রেমনীরে ভরি আশার কলস
কত-না যতনে সেচিনু তায়।
ফুলদল আসি কহে পরিহাসি
‘কোথায়, তব বঁধু কোথায়?’"

সুবালা দেবীর স্মৃতিচারণে--- "মানুষমাত্রেরই দোষ ত্রুটি ও দুর্বলতা আছে। তাঁহারও থাকা স্বভাবিক। রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করে সত্য কিন্তু রাহুমুক্ত চন্দ্র যেমন স্নিগ্ধ ও নির্মল জ্যোতিতে প্রকাশিত হয়, আমাদের প্রিয় অতুলপ্রসাদের জীবন আরো উজ্জ্বলতর রূপে আমাদের সকলের অন্তরে প্রকাশ পাইতেছে।
তাঁহার সঙ্গীতে আছে . . .

পায়ে যখন ঠেলবে সবাই,
তোমার পায়ে পাইব ঠাঁই
জগতের সকল আপন হতে আপন হবে কবে?
শেষে ফিরব যখন সন্ধ্যাবেলা
সাঙ্গ করে ভবের খেলা,
জননী হয়ে আমায় কোল বাড়ায়ে লবে।

আজ বিশ্বাস করি বিশ্বজননী তাঁহার সকল সন্তাপ হরণ করিয়া তাঁহাকে কোলে স্থান দিয়াছেন।”

মানসী মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি রোমন্থনে --- "টপ্পার সুরে গান রচনার দক্ষতা অতুলপ্রসাদের পূর্বে নিধুবাবু দেখিয়েছিলেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অতুলপ্রসাদের কৃতিত্ব হল মিশ্র টপ্পার সুরে বাংলা গান পরিবেশনে। যেমন, টপ্পা ও খেয়ালের মিশ্রিত সুরে, 'পাগলা, মনটারে তুই বাঁধ', টপ্পা ও ঠুংরির মিশ্রিত সুরে ‘ওগো নিঠুর দরদী’, ‘কে গো তুমি বিরহিনী’ ইত্যাদি।”

অতুলপ্রসাদের স্বদেশসঙ্গীত সম্বন্ধেও মানসী মুখোপাধ্যায় বলছেন, --- “তাঁর রচিত প্রত্যেকটি স্বদেশী সঙ্গীত অপূর্ব। বিদেশী সুরে রচিত তাঁর প্রথম স্বদেশী গান ‘উঠ গো ভারত-লক্ষ্মী’। ভিন্ন সুরে বাংলা শব্দ প্রয়োগে গান রচনায় এই ছিল তাঁর প্রথম ও সার্থক প্রয়াস যে বিষয়ে পরবর্তীকালে তিনি অভাবনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর স্বদেশ সঙ্গীতে ক্ষোভ আছে, লজ্জা আছে কিন্তু তিক্ততা নেই ‘হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর’ ; ‘খাঁচার গান গাইব না আর’ ; ‘মোদের গরব মোদের আশা’ প্রত্যেকটি কল্পনায়, প্রেরণায়, ভাবে, গুণে অনবদ্য।

স্বদেশ সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের নাম একেবারে প্রথম সারিতে। নজরুলও বহু স্বদেশ সঙ্গীত রচনা করেছেন এবং তাঁর ‘দুর্গম গিরি কান্তার মরু’ গানটি অবিস্মরণীয়। শৌর্য-বীর্য-ওজঃ গুণে দ্বিজেন্দ্রলাল অনন্যসাধারণ ; নজরুলের গানেও ওজঃ গুণ বর্তমান। কিন্তু অতুলপ্রসাদের স্বদেশমাতৃকার বন্দনা গান সহজতায়, মধুরতায়, ভক্তির প্রগাঢ়তায় অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী।

এই বিভাগে রামপ্রসাদী মালসী সুরে গান ‘দেখ্ মা, এবার দুয়ার খুলে’ হিন্দু মুসলমানের মিলনের উপলক্ষে রচিত। অতুলপ্রসাদ ভাবপ্রবণতার সঙ্গে সঙ্গে কত বাস্তববাদী ছিলেন এটি তারই সাক্ষ্য।”

আবার অরুণপ্রকাশ (যিনি ‘বঁধুয়া, নিদ নাহি আঁখিপাতে’ গানটি রচনার সাক্ষী ছিলেন), যখন তাঁর কর্মজীবনের উপর আলো ফেলছেন--- “ব্যারিস্টারের অনেক কাজ। প্রভাতে মক্কেলের মনোরঞ্জন,

দুপুরে জজের চিত্ত বিনোদন এবং সন্ধ্যায় মকর্দমার হার-জিতের হর্ষবেদনা লাগিয়াই আছে।....কেহ যেন মনে না করেন যে মক্কেলদের জন্য তাঁহার কোনো ক্ষতি হইত।....তাঁর জীবনটি ছিল একখানি সংগীত, তাহা পূর্ণ হইল কি অপূর্ণ রহিল তাহা ভবিষ্যতের সাহিত্যিকগণ বিচার করিবেন। কিন্তু গান গাহিয়া গলা বসিয়া যাইলে তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, 'এমন হলে তো আমার চলবে না, আমাকে যে আজ আদালতে ভিখারির গান গাহিতে হইবে'। তাই মনে হয় বিচারকদের সম্মুখেও তাঁর অন্তরাত্মা গানের প্রেরণায় মুখর হইত যাহার জন্য তিনি পরে অযোধ্যা প্রদেশের সবচেয়ে যশস্বী ব্যারিস্টার হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি জীবনে কাজকে বড় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তাই গাহিলেন :

আপন কাজে অচল হলে
চলবে না রে চলবে না।
অলস স্তুতি-গানে তাঁর আসন
টলবে না রে টলবে না'।"

অতুলপ্রসাদ যে একজন শৌখিন মানুষও ছিলেন, অমল হোমের লেখায় সে পরিচয় পাওয়া যায়, --- "তারপর একদিন তিনি আমায় নিয়ে বেড়াতে বের হলেন। তখন তাঁর ছিল একটা 'ভিক্টোরিয়া' ফিটন আর একটা সাদা রঙের বনেদী ওয়েলার ঘোড়া। সেদিন তিনি খাঁটি লখনউয়ের পোষাক-সাদা মসলিনের শেরওয়ানি 'চুড়িদার পায়জামা', 'চিকন' কাজের বাঁকা টুপি প'রে লালবাগে বল মহাশয়ের বাড়ি থেকে আমায় তুলে নিয়ে গোমতীর দিকে গেলেন।"

লক্ষ্ণৌর সাজে অতুলপ্রসাদ, সৌজন্যে সুরেশ চক্রবর্তীর 'অতুলপ্রসাদ সেন'। ২য় ছবি সৌজন্যে আনন্দবাজার।

অতুলপ্রসাদ যৌবনে দুচোখে মায়া অঞ্জন নিয়ে যে গানের তরীটি ভাসিয়েছিলেন, নিয়তির পরিহাসে সে তরী বারে বারে কূল হারিয়েছে। জীবনের সে কূলহারা তরী নিয়ে তিনি পরম করুণাময়ের কাছে চিরনির্ভরতার আশ্রয় খুঁজেছেন। ---

'আমি বাঁধিনু তোমার তীরে তরণী আমার।
একাকী বাহিতে তারে পারিনে যে আর। . . .

এখনো যা-কিছু আছে, তুলে লহ তব কাছে,
রাখো এই ভাঙা নায়ে চরণ তোমার।

এই বেদনাই তাঁর করুণ-মধুর গান সৃষ্টির মূল। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত হলেও, বিচ্ছেদ হলেও তাঁর অন্তরের হৃদয়াসনে হেমকুসুমের আসন চিরকাল অটল ছিল। জীবনের ওঠা-পড়ায় তাঁকে পাশে পান নি, হাতে হাত রেখে সংসার সমুদ্রে পাড়ি দিতে পারেন নি, মানী-গুণী হয়েও একই শহরে আলাদা বসবাস--- এ জন্য অতুলপ্রসাদের দুঃখ, কুণ্ঠা ও ক্ষোভের সীমা ছিল না। যদিও বিচ্ছেদের পরে মিলনদিনে অতুলপ্রসাদকে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠতে দেখা যায়। গান আসে তখন,--- 'কে গো তুমি বিরহিনী' বা
'আজ আমার শূন্যঘরে আসিল সুন্দর'।
আবার ভাঙনের দিনে তাঁর রচনা--- 'যাব না, যাব না, যাব না ঘরে' অথবা

'তখনি তোরে বলেছিনু মন,
যাস্ নে রে তুই এ বিপথে'

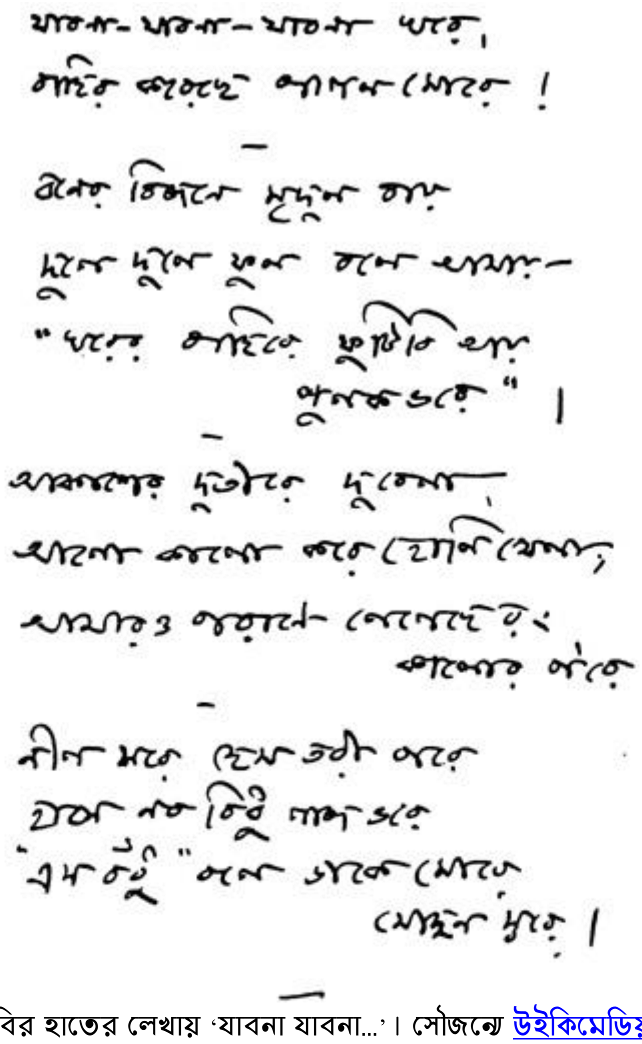

কবির হাতের লেখায় 'যাবনা যাবনা...'। সৌজন্যে উইকিমেডিয়া।

১৯১৬ সাল থেকে এই টানা-পড়েন চলেছে জীবনের শেষপ্রান্ত অবধি। এই আঁধারের পরশমণিই তাঁর সৃষ্টির আকাশে নিত্য নব নব তারার প্রকাশের কারণ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের গানে তাঁরই যেন জীবনকথা---

অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন ক'রে!
আকাশ কাঁপে তারার আলোর গানের ঘোরে॥
তেমনি ক'রে আপন হাতে ছুঁলে আমার বেদনাতে,
নূতন সৃষ্টি জাগল বুঝি জীবন-'পরে॥
বাজে ব'লেই বাজাও তুমি সেই গরবে,
ওগো প্রভু, আমার প্রাণে সকল সবে।
বিষম তোমার বহ্নিঘাতে বারে বারে আমার রাতে
জ্বালিয়ে দিলে নূতন তারা ব্যথায় ভ'রে॥

ঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃ

তথ্যঋণ ---

১। 'গীতিগুঞ্জ', অতুলপ্রসাদ সেন।
২। 'স্মৃতির খেয়া', সাহানা দেবী।
৩। মানসী মুখোপাধ্যায় রচিত 'অতুলপ্রসাদ'।
৪। সুরেশ চক্রবর্তী সম্পাদিত সংকলন গ্রন্থ 'অতুলপ্রসাদ সেন'।
৫। রবীন্দ্র রচনাবলী, ৮ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৮৮।
৬। 'অতুলপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলন', শোভন সোম।
৭। 'অতুলপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথ, নূপুরছন্দা ঘোষ, http://www.homeroam.info/, সাইট এখন খুলছে না।
৮। কবি অতুলপ্রসাদ সেনের সমাধি, কাওরাইদ ইউনিয়ন ওয়েবসাইট, বাংলাদেশ।
৯। উইকিপেডিয়া।
১0। Music Gurukul.